বিপ্লবী
নলিনী দাস



বিপ্লবী নলিনী দাস

সৌজন্য কপি
সুবোধ দাস গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ :

১৯ জুন, ১৯৮৫

প্রকাশক :

বিপ্লবী নলিনী দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে

সুবোধ দাশগুপ্ত

১০, গ্যালিফ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৩

মুদ্রক :

কালান্তর প্রেস

৩০/৬, ঝাউতলা রোড

কলিকাতা-৭০০ ০১৭

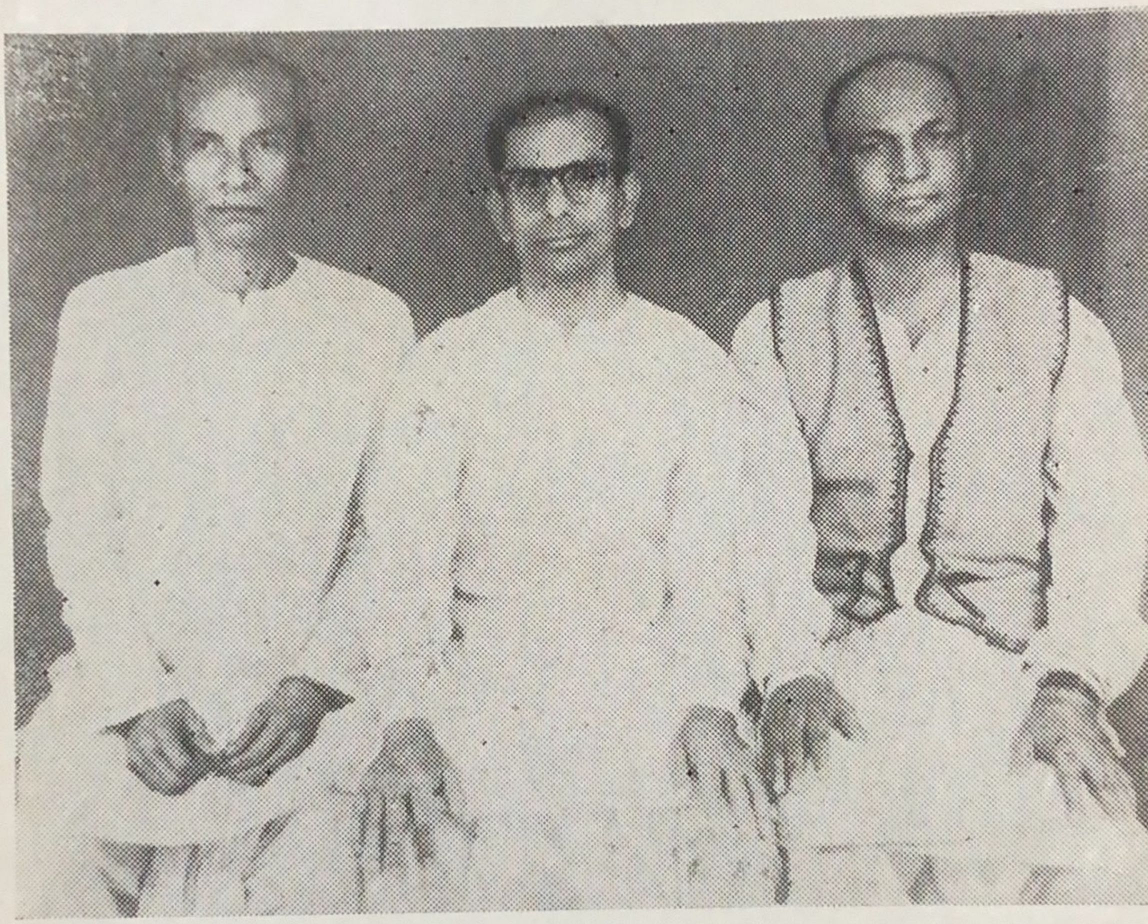
দাম :

১২ (বার) টাকা

সূচীপত্র



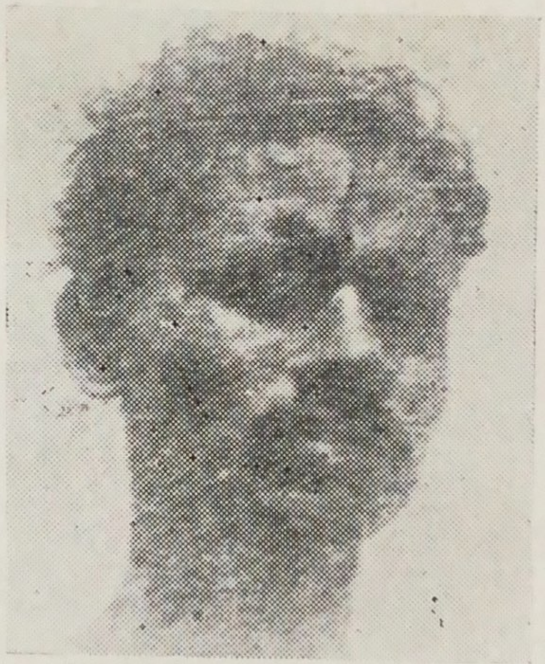
বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সময় (জুলাই ১৯৭১) ভারতে ছদ্মবেশে নলিনী দাস (বামে), এম্‌. এ গফুর (আইনজীবী) (মাঝে) ও মুকুল সেন (দক্ষিণে)



বাম থেকে দক্ষিণে ঃ

নলিনী দাস, মুকুল সেন, নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত

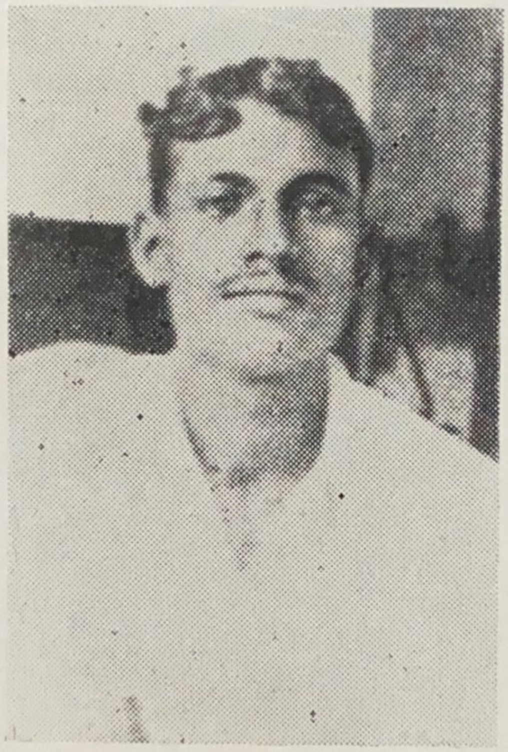
পূর্ব পাকিস্তানের সময়কার তোলা ফোটো



বিপ্লবী নলিনীমোহন দাস

১৯৪৬-এ জেল হইতে মুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কেন্দ্রের ডেকার্স লেন অফিসে গৃহীত ফোটো

ফোটো পরিচিতি ঃ হিজলী জেল হইতে পলায়নের অব্যবহিত পরে
লালবাজার পুলিশ হেড কোয়াটার্স হইতে প্রতি থানায় প্রেরিত
ফোটোর কপি



নলিনীমোহন দাস

উত্তর সাহবাজপুর, ভোলা, বরিশাল (বাংলাদেশ)

জন্ম ঃ ১৯১১

কারাবাস ঃ ২১-১১-৩০ ৫-১১-৩১

২২-৫-৩৩ - - ৪৬

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাকিস্তানে কারাবাস ঃ ১৯৫০—১৯৫৬

পাকিস্তানে আত্মগোপন-কারী জীবন { ১৯৪৮--১৯৫০
১৯৫৮—১৯৭১

মুখবন্ধ

অবিভক্ত বাংলার, পরে পূর্ব পাকিস্তান ও স্বাধীন বালাদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবী ও গণ-আন্দোলনের নায়ক নলিনী দাস ১৯৮২-র মার্চ মাসে তাঁর বাহাত্তর বৎসর বয়সে গুরুতর যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের সহকর্মীদের ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। প্রথমে প্রতাপাদিত্য প্লেসে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাড়িতে থেকে রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। পরে রোগ অতি কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেছে এটা নির্ধারিত হবার পর কলকাতাস্থিত তাঁর পূর্বতন সহকর্মীদের উদ্যোগে ডক্টর বীরেশ গুহ রোডের সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতালে ডক্টর সেনগুপ্তের চিকিৎসাধীনে তাঁর চিকিৎসা চলে। এই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাঁর ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তখন অত্যধিক দেরি হয়ে যাওয়ায় তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৯৮২-র ১৯ জুন এই বিপ্লবী নেতার মৃত্যু ঘটে।

এতে কোনো সন্দেহই নেই যে কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত অপরিসীম কৃচ্ছ্রতার মধ্যে তাঁর সংগ্রামী জীবন-যাপন, দীর্ঘকাল অবিভক্ত ভারতে ও পূর্ব পাকিস্তানে আন্দামানের সেলুলার সহ সাম্রাজ্যবাদের ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন জেলে চরম নির্যাতন ভোগ ও দীর্ঘ অনশন সংগ্রাম, চরম দুঃখকষ্টের মধ্যে একাদিক্রমে বহু বৎসর আত্মগোপনকারী জীবনযাপন—নিদারুণ যক্ষ্মা রোগ তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। বস্তুত নলিনী দাসের মৃত্যু—এও তাঁর সংগ্রামী জীবনেরই সুযোগ্য শেষ অধ্যায়।

তাঁর মৃত্যুর পরই তাঁর পূর্বতন সহকর্মী ও অনুরাগীরা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এই অসাধারণ বিপ্লবী যোদ্ধার স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া তাদের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এঁদের উদ্যোগে ও বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় ১৯৮৩-র ৩০ জানুয়ারি শহিদ-দিবসে মহাজাতি সদনের শহিদ-গ্যালারিতে নলিনী দাসের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। একই সাথে তাঁর একটি স্মরণিকা প্রকাশেরও প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ ব্যাপারে তাঁর সেলুলার জেল-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বঙ্গেশ্বর রায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্মৃতিচারণমূলক কয়েকটি রচনা, দুই বাংলার বিভিন্ন সহযোগীর, অনুরাগীর ও সংবাদপত্রের শোকবার্তা ও কিছু অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। কিন্তু হঠাৎ বঙ্গেশ্বর রায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই প্রচেষ্টায় আকস্মিক গুরুতর ছেদ পড়ে। দীর্ঘ ছেদের পরে তাঁর সহকর্মী ও অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগে আবার গতি সঞ্চার হয়। নলিনী দাসের মৃত্যুর দীর্ঘ তিন বছর বাদে এই স্মরণিকা প্রকাশনের ব্যবস্থা হলো। যেসব সংস্থা ও ব্যক্তি, যাঁরাই এই স্মরণীয়া প্রচেষ্টায় কোনো না কোনো দিক দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে নলিনী দাস স্মরণিকা প্রকাশন কমিটি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন। কালান্তর প্রেস পরিচালক-বর্গ ছাপা ও স্মরণিকা প্রকাশনের অন্যান্য সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

প্রকাশিত স্মরণিকাটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অংশে আছে নলিনী দাসের জীবনকাহিনী ও তাঁর সংগ্রামী বিপ্লবী জীবনের মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা। প্রথম সাতটিতে তাঁর সমগ্র জীবনের আলেখ্য ও মূল্যায়ন করেছেন, বিপ্লবী বন্ধু ও তাঁর সহযোদ্ধাগণ। এর মধ্যে একটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাতে তাঁর বাসস্থান ভোলা নিবাসী দুর্গামোহন দাস জনকল্যাণ ট্রাস্টের

ট্রাস্টিগণ বিপ্লবী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। পরের সাতটি রচনার ছটিতে তাঁর কৈশোর জীবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন কাল-পর্যায়ের উপরে আলাদা আলাদা রচনা আছে, যার মধ্যে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে ইংরেজি 'স্টেটসম্যান' দৈনিকের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে কলকাতার পুলিশ বাহিনীর সাথে নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখার্জীর যুদ্ধের চাঞ্চল্যকর হুবহু রিপোর্টটিও রয়েছে, আর আছে নলিনী দাসের মৃত্যুকালীন তাঁর বাংলাদেশের একটি তরুণ সহকর্মীর স্মৃতিচারণা।

দ্বিতীয় অংশে আছে শয্যাশায়ী নলিনী দাসের রোগ-সংবাদে তাঁর সহকর্মী ও অনুরাগীদের উদ্বেগের প্রকাশমূলক সংবাদ ও মৃত্যুর পরে দুই বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন শ্রদ্ধা প্রকাশের সংবাদ, সহকর্মী ও অনুরাগীদের শোক জ্ঞাপন বার্তা ও শ্রদ্ধা নিবেদন। বাংলাদেশের বর্ষীয়ান সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা মণি সিংহের দুটি চিঠির পত্রাংশ এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তৃতীয় পর্যায়ে আছে নলিনী দাসের লিখিত বিবিধ রচনা বা রচনাংশ থেকে কিছু উদ্ধৃতি। ১৯৭১-র স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে চারখানা চিঠি। তাঁর রচিত 'দ্বীপান্তরের বন্দী' পুস্তক থেকে তাঁর বিশেষভাবে মার্কসবাদে উত্তরণের লিপিবদ্ধ ইতিহাস আর 'শচীন্দ্রলাল কর গুপ্ত স্মরণে' পুস্তিকাতে নলিনী দাসের হিজলী জেল পলায়নের পরের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। স্মরণিকাতে নলিনী দাসের একক বা সহকর্মীদের সাথে তোলা জীবনের বিভিন্ন সময়ের সব সমেত ৪টি ছবি আছে

সম্পাদক

নলিনী দাস স্মরণিকা প্রকাশনী কমিটি

১৯ জুন, ১৯৮৫

নলিনী দাস স্মরণে

গনেশ ঘোষ

বিপ্লবী আন্দোলনের যে যুগে আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি ও কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, নলিনী দাসের মত দুঃসাহসী বিপ্লবী সে যুগেও সুলভ ছিল না।

সমস্ত অপমান উপদ্রব অত্যাচারকে উপেক্ষা করে তিলে তিলে বিপ্লবী শক্তিকে জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ করার যুগেও নলিনী দাসের স্থান ছিল সেই শক্তির পুরোভাগে।

আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিদারুণ অসহনীয় বড় ঝাপটায় পুরাণো মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বিপ্লবী শিবিরেও যখন অসহায় ব্যর্থতা, তখনও সাম্প্রদায়িক বাহিনীর নির্যাতন সামরিক বাহিনীর হনন নলিনী দাসকে কখনো টলাতে, স্থানচ্যুত করতে পারেনি। দেশ ভঙ্গকে নলিনীর মেনে নিতে হয়েছিল, কিন্তু মন ভাগকে সে কখনো মেনে নেয়নি বলে তাঁর সাহসেরও অভাব হয়নি।

সারা জীবন বিপ্লবী পতাকাকে দৃঢ় হাতে উড্ডীন ক'রে রাখার সংগ্রামে চরম দুঃখকষ্টে ছেদহীন নির্যাতনে জর্জর নলিনী সেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাতেই প্রাণ বিসর্জন করেন।

তাঁর জীবন আত্মত্যাগে নিয়োজিত সংগ্রামে নিরত প্রতিটি বিপ্লবীর আদর্শস্থল। জনসেবা দেশসেবার নামে আত্মসেবা ও চরম প্রতারণাই যখন যুগের হাওয়া তখন নলিনী দাসের দীপ্যমান জীবনের দীপ্তি আমাদের সকলকেই, বিশেষভাবে এযুগের তরুণ প্রজন্মকে যেন সনিষ্ঠ দেশসেবায় বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত করতে পারে।

৩০-৫-৮৫

কমরেড নলিনী দাস স্মরণে

বিনয় চৌধুরী

এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে, আমি প্রথম নলিনী দাসের নাম শুনি। ১৯৩৩ সালের ১লা মে তারিখে, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের কাছে, ভবানী দত্ত লেনের এক বাড়ীতে, হাওড়া স্টেশন হয়ে চেঙ্গাইল স্টেশন যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশন চত্তরে গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক আমি গ্রেপ্তার হই। পুলিশ প্রথমে আমাকে নলিনী দাস বলে সন্দেহ ক'রে, কারণ—নলিনী দাসের মত আমারও কপালে কাটা দাগ আছে এবং নলিনী দাসও তখন আত্মগোপন ক'রে কাছাকাছি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের এক বাড়িতে থাকতেন। আমার গ্রেপ্তারের কিছু দিন পর, ১৯৩৩ সালের ২৩শে মে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই গোপন আস্তানায় দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখার্জী এবং নলিনী দাস পুলিশের দ্বারা ঘেরাও হয়েও হয়ে পড়েন এবং রিভলভারের গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসতে গিয়ে, গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় সকলে গ্রেপ্তার হন। দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয় এবং নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং আন্দামানে যান।

পরে জেলে নলিনী দাসের সাথে আমার দেখা হয়। নলিনী দাস খুব ভাল ফুটবল খেলতে পারতেন এবং অতি দ্রুত দৌড়াতে পারতেন। এই দৌড়াবার দক্ষতা আত্মগোপন ক'রে থাকার সময়ে তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। তাছাড়া নলিনী দাস সাধারণ মানুষের সাথে একেবারে মিশে যেতে পারতেন তাদের থেকে পৃথক ক'রে তাঁকে চেতনার উপায়

ছিল না। দরকার পড়লে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ক্ষেতের কাজে লেগে যেতেন, নৌকার মাঝি সেজে নদীতে ঘুরে বেড়াতেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসে, পাকিস্তান সামরিক শাসকচক্রের হানাদাররা যখন মুক্তি যোদ্ধাদের পিছনে ধাওয়া ক'রে বরিশালের বন্দরে বন্দরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, তখন নলিনী দাস মুক্তি যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য নৌকার মাঝি সেজে কাছাকাছি থেকেছেন—ভীষণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে।

নলিনী দাস আন্দামানে থাকতেই কমিউনিস্ট কন্‌সলিডেশনে যোগ দেন এবং ১৯৪৬ সালে মুক্তি পাওয়ার পরই, বরিশালে চ'লে যান, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে সেখানে সংগঠনের কাজে আত্ম নিয়োগ করার জন্য। তিনি প্রধানতঃ কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যোগ দেন. নলিনী দাসের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছিল অনন্যসাধারণ। পুরাতন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে যে কয়জন সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যে পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়ে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে কাজ ক'রে গেছেন নলিনী দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও অগ্রগণ্য।

দীর্ঘদিনের আত্মগোপন জীবন-যাপন এবং কঠোর পরিশ্রম এই সব কারণে শেষের দিকে নলিনী দাস যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। ঢাকার ডাক্তারদের পরামর্শে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসেন ১৯৮২ সালের ১৯ জুন কলকাতার এক যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁর জীবন অবসান হয়। কেওড়াতলার মহা শ্মশানে শেষ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বরিশালের গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে নলিনী দাস নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তা' চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে বরিশালের কর্মীরা এবং জনগণ স্মরণ রাখবেন, ডাক্তার

নারায়ণ রায় এবং আমার সঙ্গে নলিনী দাসের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। যখন তিনি কলকাতায় আসতেন আমাদের সাথে দেখা হ'তো। নানা বিষয়ে আলোচনা হ'তো। বরিশালের মনোরমা বসুর এক ছেলে আসানসোলে থাকতেন। ওখানে মনোরমা বসু মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। তাঁর কাছেও নলিনী দাসের খোঁজ-খবর পেতাম। নলিনী দাস আজ আমাদের মধ্যে নেই—কিন্তু তাঁর অমর-স্মৃতি আমাদের মনকে অনুরঞ্জিত করবে—প্রেরণা যোগাবে।

বিপ্লবী দেশপ্রেমিক
নলিনী দাস স্মরণে

খোকা রায়

১৯২০ ও '৩০ দশকে গান্ধীজির অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলার যেসব সন্তান-সন্ততি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পথ গ্রহণ করেছিল নলিনী দাস ছিল তাদের ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কর্মী।

নলিনী তরুণ বয়সেই বরিশাল জেলায় বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলে যোগ দিয়ে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। সেই জেলার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নলিনী ছিল একজন বিশিষ্ট কর্মী। তাই ব্রিটিশ সরকারের পুলিস ১৯৩০ সনেই নলিনীকে গ্রেপ্তার করে এবং বিনা বিচারে জেলে আটক রাখে। পরে ১৯৩১ সনে তাকে হিজলী বন্দী নিবাসে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু নলিনীর বিপ্লবী মন কিছুতেই সে বন্দীদশা মেনে নিতে পারছিল না। তাই সুযোগ পেয়েই ১৯৩১ সনে নলিনী ও বরিশালের অন্যতম বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা প্রয়াত ফণী দাশগুপ্ত ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাও পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে হিজলী বন্দীনিবাস থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

বন্দীনিবাস থেকে বাইরে এসেই নলিনী আবার বিপ্লবী কর্ম-কাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বছর দুয়েক পরেই ১৯৩৩ সনে সে তদানীন্তন কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে (অধুনা বিধান সরণী) একটা বাড়ীতে প্রখ্যাত বিপ্লবী শহীদ দীনেশ মজুমদারের সাথে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তরুণ বিপ্লবী জগদানন্দ মুখার্জীও

তাদের সংগে একত্রে ধরা পড়েছিল। কিন্তু দীনেশ মজুমদার ও নলিনী বিনা বাধায় ধরা দেয় নি—পুলিসের সাথে তাদের প্রচুর গুলি বিনিময় হয়েছিল।

গ্রেপ্তারের পর ভারতের ব্রিটিশ সরকার দীনেশ মজুমদার ও নলিনীকে নিয়ে বিচারের এক প্রহসন করেছিল। সেই সময় সরকার বিপ্লবী আন্দোলন দমন কল্পে কতগুলি অত্যন্ত কঠোর 'আইন' পাশ করিয়েছিল। সেই আইন ও কতকগুলি বানানো সাক্ষীসাবুদের সাহায্যে—পুলিসের উপর গুলিবর্ষণ—এই মূল অভিযোগের সাথে ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার (টেগার্টকে হত্যার প্রচেষ্টা) মামলা ও চন্দননগরের পুলিস কমিশনারের হত্যা প্রভৃতির অভিযোগ মিলিয়ে সরকার দীনেশ মজুমদারকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে নিজেদের জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করেছিল। আর পুলিসের উপর গুলিবর্ষণের 'অপরাধে' নলিনীর হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। জগদানন্দেরও ঐ একই 'অপরাধে' যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। ঐ দণ্ডাদেশের পরে ১৯৩৪ সনে নলিনীকে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়েছিল। সেই জেলে নলিনীর সাথে লেখকের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্ক অটুট ছিল—নলিনীর শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার সময় পর্যন্ত।

আন্দামান জেলে পড়াশুনা করে নলিনী ক্রমে ক্রমে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। নলিনীর মুখে শুনেছিলাম যে হিজলী বন্দীনিবাস থেকে পালিয়ে বাইরে আসার পরে বাইরের বন্ধুদের সাথে আলাপ-আলোচনায় ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশেষতঃ রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তক পড়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর একটা ঝোঁক বা আকর্ষণ জেগে উঠেছিল। সেজন্যই সে আবার জেলে আসার পর থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করেছিল।

আন্দামান জেলে খুব নিকট থেকে লক্ষ্য করছি, যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে নলিনী দেশের স্বাধীনতার জন্য একদা সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেছিল ততোধিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ধৈর্য নিয়ে সে তখন শোষিত জনগণের মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ গঠনের সংগ্রামের পথ হিসাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান ও তথ্যাদি অধ্যয়ন ও রপ্ত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। '৩০ দশকের একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী কর্মী থেকে নলিনী একজন বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট কর্মীতে বিকশিত হচ্ছিল। অগ্নি-যুগের একজন বিপ্লবী কর্মীর বিপ্লবী জীবনের সার্থক পরিণতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল কমরেড নলিনী দাস।

আন্দামান জেলে নলিনীর আরও একটা বড় গুণ লক্ষ্য করেছিলাম। রাজনৈতিক মত, দল ও গ্রুপ নির্বিশেষে জেলের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর সাথে নলিনী অবাধে মেলামেশা করত—যা আমরা অনেকেই পারতাম না। তার বক্তব্য ছিল যে, আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা, এখন যে মতাবলম্বীই হোক না কেন, সবাই দেশ-প্রেমিক—সবাই বন্ধু। তাই সে বিনা দ্বিধায় সকলের সাথে মেলা মেশা করত। ফলে, সেও ছিল সকলের প্রিয় নলিনীদা।

নলিনী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল ১৯৪৬ সনে। ১৯৩৬ সনে আন্দামান বন্দীরা জেলে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। আন্দামান বন্দী-দের এটা ছিল দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘট। আন্দামান বন্দীরা প্রথম অনশন ধর্মঘট করেছিলেন ১৯৩৩ সনে। তখন তাঁদের মূল দাবি ছিল—উন্নত খাদ্য ও অন্যান্য কয়েকটি অতি সাধারণ সুযোগ-সুবিধা সহ জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের যোগ্য মর্যাদা। সেই দীর্ঘ অনশন ধর্মঘটে তিনজন বিপ্লবী বীর—মহাবীর, মোহিত মোহন নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। দীর্ঘ অনশন ধর্মঘটের পর কর্তৃপক্ষ নতি-স্বীকার করে বন্দীদের সব দাবি মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয় অনশন

ধর্মঘটে বন্দীদের মূল দাবি ছিল যে সবাইকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবেও মুক্তি দিতে হবে (Repatriation and Release)। এই অনশন ধর্মঘটের সংগ্রামে নলিনী ছিল একজন উৎসাহী অংশীদার।

মূলতঃ ঐ অনশন ধর্মঘটের চাপেই সরকার কিছুদিন পরেই আন্দামান বন্দীদের ভারতে ফিরিয়ে এনে তাঁদের স্ব স্ব প্রদেশে বিভিন্ন জেলে রেখেছিল। নলিনী ছিল ঢাকা জেলে। সেখানে থেকেই সে মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪৬ সনে দেশ বিভাগের পূর্বক্ষণে।

মুক্তি পেয়ে নলিনী কয়েকদিনের জন্য কলকাতা এসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) বাংলার প্রাদেশিক কমিটির নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিজ জেলা বরিশালে গিয়ে পার্টির কাজে, বিশেষ করে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। তখন থেকেই নলিনী ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী।

১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগের পরে ১৯৪৮ সনের ৬ মার্চ তারিখে স্বতন্ত্রভাবে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিও ঐ একই তারিখে গঠিত হয়েছিল। তখন থেকে নলিনীও পূর্ব পাকিস্তানের পার্টির সদস্য হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের পার্টি গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তদানীন্তন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার পার্টির উপর তীব্র দমননীতি চালিয়েছিল। তখন নলিনী আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করে যাচ্ছিল।

কিন্তু ১৯৫০ সনের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে বরিশাল জেলার রাকুদিয়া গ্রামে কৃষক কর্মীদের এক বৈঠক করার সময়ে

নলিনী এবং বরিশাল জেলার আরও কয়েকজন পার্টি নেতা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। নলিনী ও অন্যান্য ধৃত কমরেডদের বিরুদ্ধে পুলিস বিভিন্ন অভিযোগে মামলা করেছিল। সে মামলায় নিম্ন আদালতে বেআইনী অস্ত্র রাখা প্রভৃতি তথাকথিত অভিযোগে নলিনীর ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। সে আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলে নলিনী বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই একনিষ্ঠ বিপ্লবী কমিউনিস্ট কর্মীকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। সরকারের নূতন আদেশ বলে তাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পরে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা—আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল সে মন্ত্রিসভা ১৯৫৫ সনে একবার সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তি দেয়, এমনকি আণ্ডার গ্রাউণ্ড কমিউনিস্ট নেতাদের উপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহার করে। কমরেড নলিনীও এসময়ে মুক্তি লাভ করে। সরকার কিন্তু ঠিক একমাস পরেই তখন অনুষ্ঠিত এক পুলিস ধর্মঘটে 'উস্কানি দেওয়ার' একেবারে ডাহা মিথ্যা অভিযোগে সমস্ত কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তারে ঢালাও হুকুম দিয়েছিল। সে সময় আরও কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার সংগে নলিনীও গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিন্তু এবার নলিনীকে জেল ভোগ করতে বেশিদিন হয় নি। কিছুদিন পরেই কে. এস. পি. মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। গদীতে বসেই আওয়ামী লীগ নেতারা কমিউনিস্ট বন্দীসহ সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়েছিল। নলিনীও মুক্তি পেয়েছিল।

মুক্তি পেয়ে নলিনী বরিশাল জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হয়। এ সময়ে প্রায় দু-বৎসর বরিশাল জেলার

বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কৃষক সমিতির নামে জনসভা, কর্মীদের নিয়ে বৈঠক ও খুব গোপনে পার্টির ইউনিটের মিটিং করেছে। তার একটা বক্তব্য ছিল যে বেশি দিন সময় পাওয়া যাবেনা—তাই তাড়াতাড়ি পার্টিকে সম্ভবমত জোরদার করে তুলতে হবে। সত্যি সত্যিই বেশি দিন পাওয়া গেল না। ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বুকে নেমে এসেছিল আইয়ুব খানের সামরিক সন্ত্রাস। পূর্ব পাকিস্তানে এই সামরিক শাসন চলেছিল প্রায় ১২ বৎসর ধরে। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তখন সম্পূর্ণ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গিয়ে ছিল। স্বভাবতই নলিনীও তখন আত্মগোপন করেছিল। তখন থেকে ১৯৭১ সনের মার্চ পর্যন্ত এই প্রায় ১২ বৎসর সে নিজের আসল পরিচয় গোপন করে বরিশাল জেলার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে থেকেছে। যে সব গ্রামে সে পরিচিত ছিল না, সে সব গ্রামে পার্টির কোন সমর্থকের বাড়ির ছেলের গৃহ শিক্ষক হিসবে বা কোন স্থানে বাড়ির কর্তার গরীব ও অসুস্থ আত্মীয় হিসেবে বা কোন স্থানে বাড়ির সাময়িক অতিথি হিসেবে আণ্ডার গ্রাউণ্ড জীবন অতিবাহিত করেছে।

যে সব গ্রামে সে লোকজনের কাছে পরিচিত ছিল, সে সব গ্রামে থাকার সময় নলিনী আশ্রয়দাতার কোন একটা ঘরে সূর্য-উদয়াস্ত নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতো। সারাদিন সে ঘর থেকে বেরুত না।

সামরিক শাসন জারীর পরে লেখক পার্টির কাজে একাধিক বার বরিশাল গিয়েছে। তখন নলিনীর সাথেও দেখা হয়েছে, একটা ছোট ঘরে সারাদিন আবদ্ধ অবস্থাতে তাঁকে দেখেছে। দেখেছে, কাকভোরে ঘুম থেকে জেগে বাইরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে নলিনী সেই ঘরে এসে বসতো, আর সারা দিনের খাওয়া-দাওয়াসহ যা কাজ সবই করত সেই ঘরে। দিনে তাঁর স্নান হত না। সন্ধ্যার পর বাইরে এসে

স্নান করতো। এরকম একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যেও লেখক নলিনীকে দেখেছে সেই আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছে, তাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী কোন পুস্তক বা পার্টির কোন সাহিত্য পড়ছে, আর মাঝে মাঝে একটা খাতায় টুকটুক করে কি যেন নোট করছে। আদর্শের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা এবং পার্টি ও দেশের জনগণের প্রতি অটুট আনুগত্য না থাকলে কোন মানুষ এরূপভাবে দিনযাপন করতে পারে না। ঐ দুটো গুণই ছিল নলিনীর প্রচুর। সেটা সে বাস্তবে প্রমাণ করে গেছে।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড জীবনের কঠোরতার মধ্যেও তার মনের সজীবতা কোনদিন নষ্ট হয় নি। কোনদিন তার মনে হতাশার ছায়া পড়ে নি। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সবসময় ভালোর দিকটার উপর বেশি জোর দিত। এমন কি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ভালোর দিক দেখতে দেখতে সে কোন কোন সময় অবাস্তব পর্যায়েও চলে যেত। সেজন্য ঘনিষ্ঠ কমরেডরা কেউ কেউ তাকে বলত "Incorrigible optimist"। সুগভীর আশাবাদ তার চারপাশে কর্মীদেরও উৎসাহিত করত।

পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকারের দাবিতে আন্দোলন দমন কল্পে ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল। তার যোগ্য প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশের জনগণ সে তারিখ থেকেই দেশের মুক্তির জন্য এক অসমসাহসিক গৌরবোজ্জ্বল সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির নাম "পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি" বদলে "বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি" হয়েছিল। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজের সাধ্যমত দেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। পার্টির একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে নলিনীও সে মুক্তি সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে নিজ জেলার পার্টি ও কৃষকসমিতির কাজে নলিনী নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পার্টি ও কৃষক সমিতির কাজে সে নিজেকে এমনভাবে ঢেলে দিয়েছিল যে স্বাধীনতার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যা পর্যন্ত—এই কয়েক বৎসর সে নিজের স্নানাহার, বিশ্রাম, শরীর স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রতি দৃক্‌পাত না করে ঐসব কাজে বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছে। সে চিরদিনই বিশেষকরে দেশ বিভাগের পর থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী ছিল। তাই সে তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রতিটি জনসভায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিল। পার্টির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা নলিনীকে বারবার বলেছেন "কমরেড, আপনি পার্টির কাজে জেলায় ঘোরাঘুরি করে যেভাবে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন তাতে আপনার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে। এতে আখেরে পার্টিরই ক্ষতি হবে। আপনি ঘোরাঘুরিটা কমান। সবস্থানে নিজে না গিয়ে অন্য কমরেডদের পাঠান তাঁরাও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে শিখুক। আপনার নিজের শরীরের প্রতি আপনার একটু নজর দেওয়া দরকার।"

পার্টির নেতাদের এসব কথার জবাবে নলিনী বলতো, "কমরেড, সবই ত বুঝলাম। কিন্তু পার্টির কাজগুলি করতে হবে!"

'পার্টির কাজগুলি করতে হবে'—এই মনোভাব থেকে নলিনী পার্টি ও কৃষক সমিতির কাজে অতিরিক্ত খাটুনি খেটেছে। অন্য দিকে নলিনীর (এবং বিভিন্ন জেলার পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীদের) খাবারের মান কোনদিনই উন্নত ছিল না। উপরোক্ত দুটি ব্যাপারের ফলশ্রুতিতে তখন থেকে নলিনীর শরীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে শুরু করেছিল।

১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পরে স্বাধীন বাংলাদেশের

রাজনীতি খারাপের দিকে মোড় নিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার। অল্পদিন পরেই কায়েম হয়েছিল সামরিক সরকার ও জারি হয়েছিল—সামরিক আইন। এ অবস্থায় পার্টির অন্যান্য নেতাদের সাথে নলিনীও আবার আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গিয়েছিল। কিছুকাল পরে প্রকাশ্য হবার পর পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নলিনীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সবদিক বিবেচনা করে তাঁকে সারা জেলার দায়িত্ব নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাজ না করে, ভোলা সহরে নিজগৃহে থেকে ভোলাতে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই, সেসময় থেকে ১৯৮১ সনের শেষভাগ পর্যন্ত নলিনী ভোলাতেই কাজ করেছিল।

নলিনী ছিল ভোলার একটি বনেদী ও সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। তখন সেই ছিল পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু সেই লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি নলিনী নিজেদের ভোগে না লাগিয়ে জনহিতকর কাজের জন্য একটি ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই কাজে নলিনীর বৌদি এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এই কাজে নলিনীর এই স্বার্থত্যাগী মনোভাব ও জনগণের প্রতি তার গভীর দরদ সুপ্রমাণিত হয়েছিল।

ভোলাতে থেকেও নলিনীর ভাঙ্গা শরীর জোড়া লাগেনি। পার্টির কাজে দীর্ঘকাল অতিরিক্ত খাটুনি ও শরীরের প্রতি অযত্ন, যৌবন কালত বটেই, বেশি বয়সে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং তদুপরি বছরের পর বছর কারাবাস ও বারবার কঠোর আণ্ডার গ্রাউণ্ড জীবন প্রভৃতির মিলিত পরিণামে বৃদ্ধ বয়সে তার স্বাস্থের ক্রমাবনতি ঘটেছিল—অবশেষে ১৯৮২-র শেষদিকে সে মারাত্মক ধরণের টি. বি.-তে আক্রান্ত হয়েছিল।

পার্টির অমূল্য সম্পদ এই অক্লান্ত যোদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নলিনীকে ভোলা থেকে

ঢাকা নিয়ে এসে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। পরে আরো ভালো চিকিৎসা লাভের আশায়—সে ১৯৮২ সনের মার্চ মাসে কলিকাতায় এসেছিল, এখানে ভারতের কমিউনিস্ট বন্ধু ও প্রাক্তন আন্দামান বন্দী এবং নলিনীর অনুরাগী প্রাক্তন বিপ্লবী বন্ধুদের উদ্যোগে ও সহায়তায় যথাসম্ভব ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। নলিনীর আত্মীয় ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সবরকম ব্যবস্থা ও সাহায্য করেন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীগণেশ ঘোষ ও প্রয়াত প্রমোদ দাসগুপ্তের চেষ্টায় রাজ্য সরকার নলিনীর চিকিৎসা ব্যবস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আশাবাদী নলিনীর মনেও দৃঢ় আশা হয়েছিল যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে সে আবার নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবে। কিন্তু, যে সাংঘাতিক রোগ তাঁকে আক্রমণ করেছিল তাতে নলিনীর সে আশা পূরণ হয় নি সে আর ফিরে যেতে পারে নি। গত ১৯ জুন (১৯৮২) মধ্যাহ্নে ঐ নিঃস্বার্থ, একনিষ্ঠ বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ, কমিউনিস্ট আদর্শ বাস্তবায়নের কাজে ও শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্য নলিনী তিলে তিলে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছে।

নলিনীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিং ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ এক শোকবার্তায় বলেছিলেন "নলিনীদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি।...তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ও বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল।"

ক্ষতি শুধু বাংলাদেশেরই হয়নি। নলিনীর মৃত্যুতে ক্ষতি হয়েছে উভয় বাংলারই। বাংলা একজন প্রথমসারির বিপ্লবী দেশ-প্রেমিককে হারিয়েছে।

আর লেখক নিজে হারিয়েছে একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে

নলিনী দাস

(সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনী)

বঙ্গেশ্বর রায়

যুক্ত বাংলার বরিশাল জেলা ভোলা মহকুমায় ১৯১০ খ্রীঃ'অব্দে জন্ম।

চরিত্রে দৃঢ়, সরল সহজ স্বভাব, চির আশাবাদী, আজীবন সংগ্রামী, ত্যাগী ও চিরকুমার নলিনী দাসের জীবনী ও কর্মকাণ্ড আজকের দিনের সুবিধাবাদী ও সুযোগ-সন্ধানী রাজনীতির পরিবেশে কতটা প্রভাব বিস্তার করবে সে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে তাঁর মত চিরআশাবাদী, সংগ্রামী ত্যাগী কর্মী ও নেতার প্রয়োজন যে আজ খুবই বেশি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই প্রয়াত ঐ বিপ্লবী সম্বন্ধে দু'চারটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কার্যাবলীর ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ ও বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের জীবনীকারের জন্য আপাতত তোলা থাক।

প্রায় কৈশোরেই স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও ১৯২৪-এই তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং 'যুগান্তর' বিপ্লবীদলের সভ্য হয়ে কাজকর্ম শুরু করেন। কোন হঠকারী সন্ত্রাসবাদীর সিদ্ধান্ত নয় বরং যুগান্তরের মহান নেতা বাঘা যতীনের অবিস্মরণীয় বাণী "আমরা মরব, দেশ জাগবে" কথাটিরই সার্থক অনুসরণ যেন দেখতে পাওয়া যায় নলিনী দাসের নানা দুর্ধর্ষ

কর্মে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। জেলের সুউচ্চ প্রাচীর ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মসৃণ জীবন তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। জেল থেকে তাঁর নিক্রমণ কোন পলায়নী মনোবৃত্তি প্রসূত নয়, কাজের আকর্ষণই তাঁকে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই দেখা যায় পলাতক অবস্থায়ও তাঁকে কলিকাতা, বরিশাল, খুলনা, হুগলী চন্দননগর ও ২৪ পরগণার নানা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে।

যুগান্তর বিপ্লবী দলের অন্যতম কেন্দ্র বরিশালের শঙ্করমঠের রাজনৈতিক সন্ন্যাসী নেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের শেষ বাণীটি এই প্রসঙ্গে মনে আসে। স্বামীজী দেহরক্ষার শেষমুহূর্তে এটি উক্তিই করেছিলেন বলে শোনা যায় এবং তা হল, "হে মোর বুভুক্ষিত দেশ।" স্বামীজীর (প্রজ্ঞানানন্দ) কাছে দেশের অগনিত বুভুক্ষিত মানুষের দুঃখ কষ্টমোচনই যেন ধ্যান জ্ঞান ছিল। বিপ্লবী নলিনী দাস তাঁর লক্ষ টাকার বিষয় সম্পত্তি জনহিতে দান করে বিত্তহীনদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং স্বেচ্ছা-সর্বহারার জীবন বেছে নেন। স্বামীজীর (প্রজ্ঞানানন্দ) অন্তিম ভাবনা যেন তাঁর (নলিনী দাসের) সর্বস্ব ত্যাগ করে দরিদ্র নিঃস্ব জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ায় প্রতিফলিত।

নলিনী দাসের রাজনৈতিক জীবনের গতি ও ঘটনা পরম্পর লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশ্বাসের পরিণতির দিকে যেন ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে তাঁর জীবন ও কর্মধারা। প্রথম জীবনে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী নলিনী দাস এক দুঃসাহসী সৈনিক। পরবর্তীকালে মার্কসীয় দর্শনে যখন তিনি আস্থাবান হলেন তখন পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন শোষিত নিপীড়িত ও দরিদ্রের মুক্তিকল্পে শ্রেণী সংগ্রামের পথে। জন্মসূত্রে বিত্তবান হিন্দু পরিবারের লোক; হয়ে দাঁড়ালেন মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের চাষী শ্রেণীর সংগঠক, সংগ্রামী নেতা।

চেহারায়, কথাবার্তায় ও স্বভাবে সহজ সরল ও নিরভিমান হওয়ায়

সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যেতে তাঁর কোন অসুবিধে হত না। জনগণও তাঁকে সহজেই আপনজন বলে গ্রহণ করতেন নির্দ্বিধায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কালে খানসেনার হামলার সময় লুঙ্গি পরে নৌকার মাঝির ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে উৎসাহিত ও সহায়তা করাও তাঁর পক্ষে ঐ কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

দেশ বিভাগ হলে নিজ জন্মভূমি ভোলাতেই (তখন পূর্ব পাকিস্তান) তিনি তাঁর কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেন এবং পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলা-দেশের রাজনীতির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে যান। রাজনৈতিক বিশ্বাসের পথে চলার জন্য তাঁকে মূল্যও দিতে হয় অনেক। সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটিশের আমলে ১৪ বছরের মত কারাবাস—৪ বছর আন্দামান দ্বীপান্তর সহ। পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানে ১৯৪৮ থেকে প্রায় ১৯৭১ পর্যন্ত কখনো কারান্তরালে, কখনো পলাতক জীবন-যাপন করতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত—থাকতে হয় পাকিস্তানী কারাগারে।

আন্দামানে থাকাকালেই সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেও তাঁর মধ্যে কোন উগ্রতা ছিল না। সে কারণেই ঐ রাজনৈতিক মতবাদ তাঁকে ভিন্নমতের ও পথের কর্মী বা বন্ধুদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটায় নি। সদালাপী ও অমায়িক প্রকৃতির নলিনী দাসের দলমত নির্বিশেষে আপন করে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল—তিনি ছিলেন সকলেরই অতি প্রিয় আপনজন।

নিজেকে সাধারণের সাথে মিলিয়ে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে যাওয়ার স্বাভাবিক পরিণতিতে দুরারোগ্য কালব্যাধি যক্ষ্মা তাঁর দেহকে আশ্রয় করে। ঢাকার চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি ১৯৮২-র মার্চ মাসে কলকাতায় চলে আসেন চিকিৎসার জন্য, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কলকাতার ডাক্তার বন্ধুরা নির্দেশ দেন তাঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে। তাঁর প্রাক্তন

আন্দামানী বন্দী বন্ধুদের ও অনুরাগীবৃন্দের উদ্যোগে তাহা করা হয়। খবর পেয়েই প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ও রাজ্য সরকার এগিয়ে আসেন সাহায্য নিয়ে। বিগত ১৯ জুন ১৯৮২ এই কলকাতারই এক হাসপাতালে তাঁর জীবনবসান ঘটে।

একটি পরিপূর্ণ জীবনের—বয়সের হিসেবে নয়, জীবনের বিশ্বাস, আদর্শ ও আরব্ধ কর্মের পূর্ণতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার নিরিখে —অবসান হল।

শোক নয়! দুঃখ নয়! শুধু এই কামনা—তাঁর মানবদরদী সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি বর্তমান ও আগামী দিনের কর্মীদের চলার পথে দিক্‌দিশারী হোক।

একজন অপরাজিত বিপ্লবী

পান্নালাল দাশগুপ্ত

বিপ্লবী নলিনী দাসের সঙ্গে প্রথম জীবনে একই বৈপ্লবিক সংগ্রামে আমি যুক্ত ছিলাম। বরিশাল শহরে তাকে আমি দেখি। তৎকালীন গোপন বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার নিয়ম ছিল না। কেউ কারো কাজ সবটাই জানতো তা, জানানো বারনই ছিল। যাইহোক, মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় আমি কোলকাতায় ধরা পড়ি। ঐ মামলাটি একদা একটি বৃহৎ বিপ্লবী প্রচেষ্টার ফল। অনেকগুলি জেলাতে একই সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম সংঘটিত করার পরিকল্পনা কার্যকারী হতে না হতেই অনেকেই ধরা পড়ে যান। আমরা কেউ কেউ আগেই, নলিনী দাস কিছুদিন পরে। বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ঐ সময়ে ১৯২৮।২৯।৩০

সালে তৎকালীন দুই বৃহৎ বিপ্লবী দল, অনুশীলন ও যুগান্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় কর্মীরা 'দাদা'দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজনে লিপ্ত হয়—একত্র হবার চেষ্টা করে দুই দলে সক্রিয় কর্মীরাই। এই প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ বিদ্রোহী দল বলে আখ্যা দেয়। লক্ষ্য ছিল, এক—নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট সব 'ভাইয়েরা' কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ জাতীয় বা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে বিপ্লবী দলগুলিকে পরিচালিত করার প্রচেষ্টাকে (নেতাদের তরফ থেকে) ব্যহত করা, দুই—সশস্ত্র সংগ্রাম ও অভ্যুত্থান একই সঙ্গে বাংলার প্রত্যেক জেলাতে একই সঙ্গে সংঘটিত করা। মেছুয়া বাজার বোমার মামলা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। স্মরণ করা দরকার যে একমাত্র চট্টগ্রামেই সুর্য সেনের নেতৃত্বে জাতীয় একটি অভ্যুত্থান হয়। বাকীরা সব ব্যর্থ হয় এবং প্রায়ই সকলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান।

এই প্রচেষ্টায় মধ্যে যুবক নলিনী দাসও ছিলেন—এবং তিনিও কিছুদিনের মধ্যে ধরা পড়েন। প্রায় দুই বছর পরে হিজলি বন্দী নিবাসে তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। ঐ বন্দীনিবাসে গুলি চলা এবং সন্তোষ মিত্র ও তারক সেনের মৃত্যুর পর, কিছুদিনের মধ্যেই নলিনী দাসও হিজলি ক্যাম্প খেকে পালিয়ে যান। তারপর তিনি আবার ধরা পড়েন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী থেকে, পুলিসের সঙ্গে গোলাগুলি বিনিময় সংঘর্ষের পর এবং দীর্ঘ সাজা নিয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হন।

মোট কথা যদিও আমরা এক অর্থে সহকর্মীই ছিলাম তবু কার্যকারণক্ষেত্রে নলিনী দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার বা একই সঙ্গে একত্রে কোন বিশেষ কাজে যুক্ত হবার সুযোগ আমার হয় নি। জেল জীবনেও ভিন্ন ভিন্ন জেলে কেটেছে। জেলে তিনি মার্কসবাদী শাস্ত্র পড়ে কমিউনিস্ট হয়ে বাইরে আসেন ও তৎকালীন

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে কাজ করেন এবং বরিশালেই বোধহয় তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়। দেশভাগ ও স্বাধীন হবার পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন না—কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যান এবং শুনেছি গোপন ও আধা-গোপন কর্মী হিসেবে ওখানেই কাজ করতে থাকেন। বলাবাহুল্য কর্মক্ষেত্র ভারতেই ছিল। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন যোগসূত্রই ছিল না।

কিন্তু ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে দমদম বসিরহাট মামলার মেয়াদ খেটে যখন আমি বের হই, তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিছু কিছু তরুণ যুবক (মুসলমান) গোপনে এদেশে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানে যে কেবলই হিন্দু নিধন ও বিতাড়ন যজ্ঞ চলছে তা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী একটা শক্তিও জেগে উঠছে—প্রধানত ভাষা আন্দোলনকে আশ্রয় করে। এই তরুণ বিদ্রোহীদের মুক্ত চিন্তা দেখে আমি বিস্মিত হই। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি প্রগতিবাদী চিন্তা তাঁরা রপ্ত করছেন। এমনকি সশস্ত্র-বিদ্রোহ করার প্রচেষ্টাও কেউ কেউ করছেন। এইসব কাজে আমার পক্ষে কিছু সাহায্য করা হয়তো সম্ভব, তা আশা করেই পূর্ব পাকিস্তানের ঐসব তরুণেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, বারে বারে। সে ইতিহাস আমি অন্যত্র একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখি (কম্পাসে) অবশ্য খুবই সংক্ষেপে।

ঐ সময়ে কারা কারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতশীল ও বিপ্লববাদী সংগ্রামে লিপ্ত আছেন, তা আমি যথাসম্ভব জানবার চেষ্টা করি—বিভিন্ন সূত্র দিয়ে, কখনো কখনো লোক পাঠিয়েও এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা এমনিতেই আসতেন বা আসা-যাওয়া করতেন তাদের মুখ থেকে। সবিস্ময়ে জানতে পারলাম যে নানাদিক থেকে, নানা দল-

উপদল থেকে এজাতীয় প্রচেষ্টা বরাবর চলে এসেছে। সেই সময়েই জানতে পারলাম, যে সব অগ্রণী কর্মী ঐ সংগ্রামে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের সেই নলিনী দাস, মুকুল সেন ইত্যাদি। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, সতীন সেনদের নিষ্ঠা ও ও সংগ্রাম সর্বজনবিদিত।

পরাধীন ভারতের বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা বা দেশভাগের এই চিত্র একদম পাল্টে যায়। প্রগতিবাদীরা ও বিপ্লবীরা প্রায় সবাই ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে এদেশে চলে আসেন—এই পশ্চিমবাংলার রাজনীতিটা প্রাক্তন পূর্ববাংলার কর্মী ও নেতারাই দখল করে নেন এবং নিজেদের জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেন। যে-কতিপয় জেদী অসমসাহসী ও নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ঐ দেশেই অনেক মার খেয়ে, অনেক জেল নির্যাতন ভুগেও মাতৃভূমির মুক্তির জন্য পড়ে রইলেন, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট অন্যতম হলেন নলিনী দাস। এইসব দুঃখকষ্ট ও বিপদ স্বেচ্ছাবরণ করে পড়ে থাকার জন্য স্বভাবতই তাঁরা আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

১৯৬২ সালের পর থেকে বেরিয়ে এসে আমি পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্ত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি বিকাশলাভ করছে তাদের প্রতি নজর রাখি। এবং পশ্চিমবঙ্গে ও দিল্লীতে যাতে এইসব কথা যথাযথভাবে প্রচারিত হয় তার চেষ্টা করি। ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য এই রাজ্যও নানা অনুষ্ঠানের-মারফৎ প্রকাশ করার চেষ্টা করি। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশে যে বাংলাভাষার উন্নতির জন্য বিপুল প্রচেষ্টা হয় বহু ধরনের গবেষণা, পুস্তক, পুস্তিকা, প্রকাশ হতে থাকে তার প্রদর্শনী (এক ধরনের 'বইমেলা') করি। তাছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য—সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে উপস্থিত করবার

চেষ্টা করি। কিন্তু এসব সম্ভবই হোতো না, যদিনা নলিনী দাসদের মত নিষ্ঠাবান সত্যিকার বিপ্লবীরা বরাবর ওখানে পড়ে না থাকতেন।

অবশ্য হিন্দু বিপ্লবীদের এই দাবি সম্পূর্ণ নয়—বেশির ভাগ প্রচেষ্টারও জাগরণে নবীন প্রজন্মের মুসলমান ছেলেমেয়েদেরই অবদান অনেক বেশি। স্বভাবতই বুঝতে হবে যে মুষ্টিমেয় হিন্দু বিপ্লবীরা যতই বিপ্লবী হোন তাঁদের প্রভাবটাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক প্রচার ও নির্যাতন দিয়ে কাবু করে দিতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল ও প্রধান সম্প্রদায়—অর্থাৎ কোটি কোটি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই নব জাগরণ আসছে—তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় ও স্বধর্মীয় কর্মীদের নেতৃত্বে—ততদিন এই দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার প্রকৃত রূপ এতবড় একটা বিশাল গণঅভ্যুত্থানের আকার নিতে পারে নি।

যে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নলিনী দাস বাংলাদেশের সত্যিকার মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন, তার প্রতি এই শ্রদ্ধা জানানো আমার প্রধানতম কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করি। দুঃখের বিষয় যে আমি তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ জানি না। যদি উনি ডাইরী জাতীয় কিছু রেখে যেতেন সেটা যেমন ইতিহাস রচনার দিক থেকে, তেমনি সকল সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় দলিল হতে পারতো। আশা করি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা এ অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করবেন।

এই প্রসঙ্গে নলিনী দাসের একটি উদ্যোগকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি, যে উদ্যোগটি বাংলাদেশে নয়, কলকাতায় এসে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

তখন ষাটের দশকের শেষ দিক। পশ্চিম বাংলায় তখন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার। তখনও প্রধানত জরুরী চিকিৎসার জন্যই

বোধ হয় কলকাতায় এসেছিলেন, অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে। ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি ও আমার সহকর্মীরা প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি যে কর্মসূচী পালন করতাম, নলিনী দাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তা তাদের দেশের অসাম্প্রদায়িক গণ-আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তি যোগাত, এপার বাংলায় অসাম্প্রদায়িকতার সমর্থনকারী এই প্রয়াসে। আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচী যাতে আরো খানিকটা ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, নলিনী নিজে এবার কলকাতায় এসে তারজন্য উদ্যোগ নিলেন। পশ্চিম বাংলায় পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের প্রতি সংগঠিত সমর্থন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসাহ যোগাতে ও দুই বাংলার মধ্যে গণতান্ত্রিক মৈত্রী বন্ধনকে গড়ে তুলতে কতখানি সাহায্য করে নলিনী কলকাতায় এসে তাঁর বহুদিনের পরিচিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির দুজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন সদস্যকে আলোচনার মাধ্যমে তা বুঝিয়ে বলে আমাদের কর্মসূচীর কাজে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে আমাদের ওই কর্মোদ্যোগ যে নিশ্চয়ই আরো কিছুটা সফল হয়ে উঠেছিল তা সন্দেহাতীত। এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও স্বচ্ছতার মূল্য অনেকখানি।

নলিনী দাস

জ্যোতি দাশগুপ্ত ও মুকুল সেন

নলিনী দাস সত্তর বছরের উপরে পরিণত বয়সে মারা গেছেন। প্রায় ষাট বছর তাঁর কর্মময় জীবন। তাঁর কীর্তিময় জীবন এবং সেই

সঙ্গে তাঁর ধ্যান-জগতের অবিরাম চলমানতা ও সৃষ্টিশীলতা বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। সে-ই তার সর্বোচ্চ স্মারক।

বিপ্লবীর জীবন; বিপ্লব সম্পূর্ণতার পূর্বেই অবসান। কিন্তু বিপ্লব সম্পূর্ণ না হলেও বিপ্লবীর জীবনের সম্পূর্ণতায় কোন ফাঁক নেই, ছেদও নেই।

রাজনীতি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সীমিত; কিন্তু বিপ্লব মানুষের মুক্তির মহা-দিগন্তে প্রসারিত। মানুষের মুক্তির জন্য প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা শপথকারীর জীবনে অবিরাম নিজেকে ঢেলে সাজাবার তাগিদ উপস্থিত করে; পৃথিবীকে বদল করার জন্য নিজেকে বদলাতে হয় বারেবার। তার সঙ্গে জীবনভর পাল্লা দিয়ে চলা বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। নলিনী দাস সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুরুষ।

নলিনী দাসের সাহসিকতা কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিল। নিজেকে নিঃশেষে দান করার শপথ যে অত্যুজ্জ্বল বীরত্বের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সে ছিল প্রারম্ভিক পর্যায়ে। আত্মনিবেদনের এমন ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষকে অবশ্যই এক ধ্রুব চৈতন্যর দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু নিজেদের মুক্তির রথ মানুষকে যে নিজেদেরই টানতে হবে— এ কাজ কোনও ক্রীতদাস দিয়ে হবে না, কোন মহানুভবকে দিয়ে এমনকি ভগবানকে দিয়েও নয়। সেই মানুষ যারা পতিত ও দুর্বল এবং তাদের হীনমন্যতার দরুণই যে দুর্বলতা পাথরের মতো শক্ত, যারা অশিক্ষায় অন্ধ এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক, কুশিক্ষার দ্বারা বিকৃত দৃষ্টি, তাদেরই পাথরের ফুল বানাবার জন্য সর্বদা বিপ্লবীর নিকট চ্যালেঞ্জ। নলিনী দাস সেই কর্তব্যে বিজয়ী হয়েছেন। শতশত বিপ্লবী আজ নিজেদের মধ্যেই নলিনী দাসকে পাচ্ছেন।

সাধারণের একজন হয়ে অসাধারণ হবার গুণ নলিনী দাসের বুঝি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। নিতান্ত আটপৌরে চেহারার মধ্যে বজ্রের শক্তি ইংরেজ শাসকদের যেমন ঘোল খাইয়েছিল, তেমনই গ্রামের

দশজনের মধ্যেই তার নিতান্ত একজন হয়ে থাকার আত্মগোপনের সামর্থ্য প্রকৃতিগত স্বাভাবিকতা অর্জন করেছিল। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী নলিনী দাসদের ধাঁচেই গড়া।

বিপ্লব সম্পূর্ণ না হওয়ায় স্বদেশের মানুষ এখনো ইতিহাসের নায়ক নয়, তবে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষ জাগছে—দেশের এই সন্ধিক্ষণে কি চেতনার ক্ষেত্রে, কি কাজের আঙ্গিনাতে, কি সংগঠনের মাধ্যমগুলিতে বিপ্লবের জীবাণু অনুপ্রবেশের দ্বারা সেগুলিকে মথিত ও মন্দ্রিত করে তোলার আজীবন সাধনায় নিবেদিত একজন মানুষ ছিলেন নলিনী দাস। ফলে যত দিন যাবে নলিনী দাস ততবেশি জীবিত হবেন।

মুক্তির জন্য বিপ্লবের মন্ত্র ছাড়তে চাননি বলেই নলিনী দাসকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে উঠতে হয়েছে। দুধের বদলে ঘোল পেয়েই যারা খুশি, নলিনী দাসকে সে সুবিধাবাদ জীবনে স্পর্শ করে নি। শোষণহীন বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমস্বরূপ মেহনতী জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্যান ও কর্ম থেকে একমুহূর্তের জন্যও তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন নি। আর সেজন্যই লেনিনের নভেম্বর বিপ্লব, তাঁর সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তারই বীজে প্রস্ফুটিত বর্তমান বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর নয়নের মণি ছিল।

নলিনী দাস একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ব্যক্তিতান্ত্রিক বিপ্লববাদকে জাতীয় বিপ্লবের গ্রন্থীতে এবং জাতীয় বিপ্লবকে বিশ্ব-বিপ্লবের গ্রন্থিতে সংলগ্ন করে দেখার অন্যতম কারিগর নলিনী দাস যুগ-পুরুষ। ফলে নলিনী দাসের জীবন, কর্ম-প্রয়াস ও সাধনা নিয়ে সুগভীর চর্চা যত না প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আবশ্যক, তার চেয়ে অনেক বেশি জীবিত উত্তর-পুরুষদের আপন গরজে অপরিহার্য।

নলিনী দাস ও দুটি কথা

[দুর্গামোহন দাস জনকল্যাণ ট্রাস্ট-এর ট্রাস্টিগণ কর্তৃক লিখিত। রচনাকালে নলিনী দাস জীবিত ছিলেন]

শ্রীনলিনী দাস ভারত উপমহাদেশের এক কিংবদন্তীর নায়ক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক, স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য পরিচালিত সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম নেতা, সকল সামাজিক অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনগণের নিকটজন নলিনী দাস ১৯১০ সালের ১ জানুয়ারি বরিশাল জিলার উত্তর সাহাবাজপুরে সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হতে ভোলাতেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত। পিতা মৃত দুর্গামোহন স্থানীয় জমিদারী এস্টেটের নায়েব ছিলেন।

শিক্ষা জীবন ভোলাতেই শুরু হয়। ১৯২১ সালে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আহ্বানে হরতাল ও ধর্মঘটে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র নলিনী দাসও অংশগ্রহণ করেন। এ কারণে ভোলাতে যে ৫ জন ছাত্র গ্রেপ্তার হয় তিনি তাদের অন্যতম। জীবনে এই প্রথম কারাবরণ। ভোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালে বি. এম কলেজে আই. এস. সি'তে ভর্তি হন। বরিশালে তৎকালে তিনি একজন কৃতি ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু আই. এস-সি পরীক্ষার পূর্বেই কলিকাতা মেছুয়া-

বাজার বোমার মামলার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। শুরু হয় পলাতক জীবন।

পলাতক অবস্থায় ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যার প্রচেষ্টা মামলায় তিনি খালাস পেলেন, কিন্তু তৎকালীন সরকার তাঁকে ডেটিনিউ করে প্রেসি-ডেন্সি জেলে প্রেরণ করে। ১৯৩১ সালে তাঁকে হিজলী ক্যাম্পে পাঠান হয়। ঐ ক্যাম্পেই ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাজবন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিতে কলিকাতার সন্তোষ মিত্র ও বরিশালের তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। বহু রাজবন্দী আহত হন। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে নলিনী দাস ও ফণী দাশগুপ্ত হিজলী জেল হতে পলায়ন করেন। আবার পলাতক জীবন। ১৯৩২ সালে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের পুলিশ দিনের বেলায় তিনি যে বাড়িতে ছিলেন, ঘেরাও করে। সে বাড়িতে তখন তিনি ছাড়া আর দুইজন বিপ্লবী ছিলেন। দীনেশ মজুমদার যিনি টেগার্ট হত্যার প্রচেষ্টা মামলায় যাব্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ও মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার হতে পলাতক ও ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টা মামলার আসামী বীরেন রায়। মাত্র এই তিনজন বঙ্গবীরের সহিত চন্দননগরের রাস্তায় সেদিন ৪ ঘন্টাব্যাপী পুলিশের গোলাগুলি চলে। বীরেন রায় প্রথমেই গ্রেপ্তার হন। উক্ত খণ্ডযুদ্ধে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার কিউ সাহেব নিহত হন। অনেক পুলিশ আহত হয়। শেষপর্যন্ত আহত অবস্থায় নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার পালাতে সক্ষম হন।

চন্দননগরের ঘটনার পর কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বিপ্লবী কর্মী নারায়ণ ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জী আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২২. ৫. ৩৩ তারিখে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ১ টায় ঐ বাড়ী ঘেরাও করে। বিপ্লবীদের

আবার পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। যুদ্ধে ডি. এস. পি, পোলার্ড এবং ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টর মুকুন্দ ভট্রাচার্য আহত হন। বিপ্লবীরা আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। মামলায় দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী হয় এবং নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে ১৯৩৪ সালের মে মাসে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

আন্দামানের সেলুলার জেল। ব্রিটিশ ভারতের নিকৃষ্টতম জেল। সেখানে রাজবন্দীদের মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হত। পশুর খাদ্য খেয়ে তাঁদের বাঁচতে হ'ত। শুরু হল সেখানে এক প্রতিরোধের আন্দোলন। বারবার অনশন ও ৩ জন বন্দীর অনশনে মৃত্যুবরণ রাজবন্দীদের জীবনে নিয়ে এলো কিছু স্বাচ্ছন্দ্য। বিপ্লবী বন্দীরা পড়াশুনার কিছুটা সুযোগ পেলেন। "বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন করে তাঁরা পড়াশুনায় গভীর আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময়ই নলিনী দাস আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় দেশে ফিরে আসার জন্য বন্দীরা কারান্তরালেই আবার আমরণ অনশন শুরু করেন। তার সমর্থনে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের চাপের মুখে বৃটিশ সরকার রাজবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনে। ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি নলিনী দাসকে কলিকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৩৮ সাল হতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বহু রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু নলিনী দাস সহ ৩০ জন রাজবন্দীকে "ভয়ানক বিপ্লবী ব্যক্তি" রূপে চিহ্নিত করে সরকার আটক রাখে। আলীপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ নলিনী দাস জেলে বসেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলো তখন

এই সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নলিনী দাসকে ব্রিটিশ সরকার মুক্তি দেয়। মুক্তি পেয়েই নলিনী দাস ও তার বন্ধুরা বর্বর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জীবনকে বাজি রেখে তাঁরা সকল দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে ঘুরে দাঙ্গার প্রতিরোধ কমিটি গঠন করলেন। একাজেও তাঁদের বহু বন্ধুকে জীবন দিতে হ'লো।

ভোলাতে পার্টি খুবই দুর্বল, তা সত্ত্বেও মুক্তির পর নলিনী দাস ভোলাতে জনগণের যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা ভোলাবাসীর চিরদিন মনে থাকবে। দেশ বিভাগের কয়েকদিনের ভিতরই স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে। ১৯৫০ সালের নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালে নলিনী দাস ও তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা বাবুগঞ্জ থানায় রাকুদিয়া গ্রামে কৃষক নেতা নজুমদ্দিন ফরাজীর বাড়িতে কৃষকদের নিয়ে সভা করছিলেন। একদল দাঙ্গাকারী সে বাড়িতে চড়াও হয় (১৬-২-৫০)। ফরাজী সাহেব রুখে দাঁড়ালেন, 'আমাকে খুন না ক'রে আমার বন্ধুদের খুন করা যাবেনা' সে বাড়ির ছেলেমেয়ে ও মুসলমান কৃষক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিছুতেই যখন দাঙ্গাকারীদের ফেরানো যাচ্ছেনা তখন মূলতঃ নলিনী দাসের উপস্থিত বুদ্ধিতে তাদের বোঝানো হলো 'এদের মেরে আর কি হবে? পুলিশের নিকট ধরিয়ে দাও, পুরস্কার পাবে।' চরম আহত অবস্থায় নলিনী দাস, হীরেন ভট্টাচার্য (যিনি উজিরপুর স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন), জিতেন মিস্ত্রিসহ নজুমদ্দিন ফরাজী প্রভৃতি লোকদের পুলিশের নিকট সমর্পণ করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। ঐ মামলায় নলিনী দাসের ১০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মহামান্য হাইকোর্ট তাদের মুক্তি দেন। জেল গেটে পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫৫ সালের শেষের

দিকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা তাকে মুক্তি দেয়। ১৯৫৯ সালে আয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারির পর তিনি পুনরায় পলাতক হন। তৎকালীন সরকার তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত তিনি পলাতক জীবন যাপন করেন। কতবার তাকে পুলিশ ঘেরাও করেছে। কিভাবে তিনি তাদের চোখে ধুলা দিয়ে ঘুরে ঘুরে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করেছেন তা আমাদের নিকট এক চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয় কাহিনী।

ভাষা আন্দোলন সহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, কৃষক মজুরদের বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক আন্দোলনে তিনি জনগণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। আমরা ভোলাবাসী সকলেই জানি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে 'দাদা' আমাদের পাশেই ছিলেন। দুদিনে তিনি আমাদের কাছে থাকবেনই। তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দুর্গামোহন দাস জনকল্যাণ ট্রাস্টির নিকট দান করেছেন।

তার সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস এ ক্ষুদ্র পরিসরে লেখা অসম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশের এই কিংবদন্তীর নায়কের সকল ঘটনা ও রোমাঞ্চকর কাহিনী আমরাও সকল জানি না। মোটামুটি এইটুকু জানি তার প্রায় ৭০ বছরের ২৩ বছর আন্দামান, ব্রিটিশ ভারতীয় জেলে ও পাকিস্তানের জেলে কেটেছে, ২০ বছর ৯ মাস কেটেছে পলাতক জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায়—যার কিছু পরিচয় পাই আমরা তার লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' বইতে।

আজ তিনি বয়সে বৃদ্ধ। আজো তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য, তাদের অর্থ-নৈতিক মুক্তির জন্য যুবকের ন্যায় অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে কাজ করে চলেছেন। চলুন, আমরা আমাদের আন্তরিক দেশপ্রেম, সততা নিয়ে তাকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করি, তার এই জনকল্যাণ

ট্রাস্টি বোর্ডের কল্পনাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি ও তার ত্যাগ তিতিক্ষা ও দেশগড়ার বিপ্লবী চেতনার আলোকে নিজেদেরকে উজ্জ্বল করি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ :

দুর্গামোহন দাস ট্রাস্টি ভবন
ভোলা,
২১-১০-১৯৭৮

মন্তাজ উদ্দিন আহম্মদ
আবুয়াল ফারাহ মোল্লা
শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস

অবিস্মরণীয় বিপ্লবী নলিনী দাস

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় নলিনী দাসের জন্ম, আর ১৯৮২-র ১৯ জুন কলকাতার এক হাসপাতালে ৭২ বছর বয়সে তিনি চোখ বুজলেন। এই ৭২ বছর বয়সের ৫০ বছরেরও বেশি সময়, নলিনীদা সক্রিয় ছিলেন দেশের স্বাধীনতা ও শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রামে। সেই অর্ধশতাব্দীর অর্ধেক সময়—২৫ বছর তিনি ছিলেন ইংরেজের অথবা পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকবর্গের কারাগারে বন্দী। আরও প্রায় ১৫ বছর তিনি কাটিয়েছেন ফেরারী আত্মগোপনকারীর জীবনযাপন করে।

শুধু তাই নয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, ২২ বছর বয়সে, অসাধারণ দুঃসাহস দেখিয়ে তিনি পালিয়েছিলেন ইংরেজদের হিজ্‌লী বন্দী-শিবির থেকে—সঙ্গে বিপ্লবী সহকর্মী ফণী দাশগুপ্ত। এই হিজলী বন্দীশিবির থেকে মাত্র আর একবার রাজবন্দীরা পালাতে সক্ষম হন—১৯৪১-এ দুই বন্দী কমিউনিস্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্তী।

তারপর দীর্ঘ দেড়বছর আত্মগোপন করে থাকেন নলিনী দাস।

অবশেষে ১৯৩৩-এর ২৩ মে টেগার্টের গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের সন্ধান পেয়ে ঘিরে ফেলে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি বাড়ি। সশস্ত্র বিরাট পুলিশ দলের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ চালান তিন বাঙালী তরুণ—নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। পিস্তলের শেষ গুলিটি পর্যন্ত লড়ে যান তাঁরা। তারপর বন্দীদের উপর চলে চরম নির্যাতন।

১৯৩৪-এ আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হয়ে তাঁরা শুরু করেন দীর্ঘ অনশন ধর্মঘট—রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে। ১৫ দিন সংগ্রামের পর দাবি আদায় করেন, তাঁরা খবর পেলেন যে সবকজনেরই ফাঁসী হবে। এমনকি জেলের কর্তৃপক্ষ তাদের শেষবারের মত পছন্দ-মত খাবারও দেবার ব্যবস্থা করলেন। শেষমুহূর্তে ইংরেজ সরকার মত পরিবর্তন করে, ফাঁসী দিল শুধু দীনেশ মজুমদারকে, বাকি ২ জনকে পরদিনই চালান করে দিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে, সুদূর আন্দামানে। পারঘাটায় জাহাজে পুলিশের বড়কর্তা নলিনীকে বলে গেল—আর তোমাদের দেশে ফিরতে হবে না। নলিনী দাস দৃপ্ত জবাব দিয়েছিলেন : আমরা দেশে ঠিকই ফিরব, দেশ স্বাধীনও নিশ্চয় করব। কিন্তু তোমাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বরিশাল জেলার নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় নলিনী দাস, আন্দামানের বন্দীশালায় অদম্য উৎসাহে গড়ে তুললেন বিপ্লবী বন্দীদের নিয়ে ফুটবলের দল। আর তারই পাশাপাশি চলতে থাকল ১০।১২ ঘণ্টা ধরে নিরলস অধ্যয়ন—মুক্তিবিপ্লবের সঠিক পথের সন্ধান চাই। সেই সাধনা তাঁকে পৌঁছে দিল, আরও অনেকের সঙ্গে কমিউনিজমের আদর্শে। তিনি যোগ দিলেন আন্দামান জেলের 'কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে'—১৯৩৫-এর পয়লা মে তিনি এবং আরও ৩৪ জন বিপ্লবী বন্দী আন্দামানের জেলখানার মাঠে উড়িয়ে দিলেন সর্বহারা বিপ্লবের রক্তপতাকাকে, ঘোষণা করলেন : আমরা

কমিউনিস্ট। তার এক বছর আগেই বেআইনী ঘোষিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

১৯৩৭-৩৮'এ বাংলাদেশ, বিশেষতঃ কলকাতা শহর তোলপাড় হল আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিরাট ছাত্র আন্দোলনে। তার জোরে আন্দামান থেকে সমস্ত রাজবন্দীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হল ইংরেজ সরকার এবং তারা মুক্তিও দিল শতকরা ৯০ জন বিপ্লবী বন্দীকে। কিন্তু ছাড়া পেলেন না কয়েকজন বাঘা বিপ্লবী— চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বীরেরা, শহীদ ভগৎ সিং-এর বীর সাথীরা এবং নলিনী দাসের মত অল্প কয়েকজন। আরও প্রায় এক দশক পরে ১৯৪৬-তে, দ্বিতীয় দফা ছাত্র সংগ্রামের জোয়ারে তাদের জেলের তালাও খুলে গেল—১৪ বছর বন্দী থাকার পর ১৯৪৬-এর ৩১ আগস্ট মুক্তির নিশ্বাস নিলেন নলিনী দাস ও অন্যান্য বন্দী বীরেরা।

কিন্তু বিশ্রাম নিলেন না কেউই। জেল থেকে বেরিয়েই নলিনী সোজা গেলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে, কৃষক আন্দোলন গড়ার সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে গেলেন জন্মভূমি বরিশালে। একবছর পরে এল স্বাধীনতা ও দেশভাগ। নলিনী দাস রয়ে গেলেন বরিশালে, পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা ১৯৫০-এ গ্রেপ্তার করল তাঁকে এবং ৫ বছর আবার তার ঘরবাড়ি হল জেলখানাই।

১৯৫৮-তে পূর্বে পাকিস্তানে আয়ুবের জঙ্গীশাহী ক্ষমতা দখল করল। গ্রেপ্তার হলেন বহু কমিউনিস্ট নেতা। নলিনী দাস সময়মত আত্মগোপন করলেন ও সেইভাবে একটানা কাজ করে গেলেন ১৯৭১ অবধি। ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্থান জুড়ে বাঙালীর ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়ে গেলে, নলিনী দাস সেই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বাংলাদেশের তরুণ মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে সমান তালে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াই চালিয়ে গেলেন নলিনী দাস।

১৯৭১-র জুন মাসে যখন আর বরিশালে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন বন্ধু, সহকর্মীদের নিয়ে, মৃত্যুর সাথে বহু পাঞ্জা কষে, সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌছুলেন নলিনী। সেখানেও বিশ্রাম নেই—দিবারাত্রি পরিশ্রম, সীমানার এপারে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে শিবিরে বক্তৃতা করে ও তাদের উৎসাহ দিয়ে। বরিশালের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাই দলমতনির্বিশেষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাত অকুণ্ঠভাবে এ প্রবন্ধের লেখকের তা বহুবার স্বচক্ষে দেখা।

১৯৭১-এর ১৬ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ শেষ হল—জন্ম পেল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বছর না শেষ হতেই নলিনী দাস ফিরে গেলেন বাংলাদেশ, তার প্রিয় বরিশালে। সেখানেই তিনি সক্রিয় ছিলেন গত ১০ বছর, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও আত্মগোপন করে, কিন্তু সবসময়ই কৃষক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে।

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে দ্রুত। পুষ্টিকর খাবার জোটে নি, জোটে নি ওষুধও সবসময়। অদম্য মনোবল নিয়ে লড়ে গেছেন তিনি, মুখে সব সময় অপরাজেয় হাসি।

একেবারে শেষসময়ে ১৯৮২-র মার্চের শেষে এলেন কলকাতায়। ৩ মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চোখ বুজলেন ১৯৮২-র জুন। শহীদ ভগৎ সিং-এর ফাঁসীর দিনের স্মৃতিসভায় যাবার পথে তার সঙ্গে শেষ দেখা। সঙ্গে ছিলেন ভগৎ সিং-এর সাথী বিজয় সিংহ। তাকে জড়িয়ে ধরলেন নলিনীদা। আমাকে বল্লেনঃ সেরে উঠে দেখা করব, অনেক কথা আছে।

সে কথা আর শোনা হল না। এমন অসামান্য বিপ্লবী, অথচ এত সাধারণ—এঁরাই সাচ্চা কমিউনিস্ট! পৃথিবী এদের মা, আনাটিউসের মতই এরা অপরাজেয়।

[লেখক সমাবেশ, প্রথম পক্ষ, ১৯৮২]

নলিনী দাসের ছাত্রজীবন

সুবোধরঞ্জন চক্রবর্তী

১৯২৪ সনে মাত্র চার পাঁচ মাস পিরোজপুর থাকার পর আমরা ভোলা এসেছি, তখন জানুয়ারি মাস, গভর্নমেন্ট স্কুলে আগের ক্লাসে ভর্তি হতে নলিনীর সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য হল।

ক্লাস আট-এর ছাত্র আমরা ক্লাসেই নলিনীর সাথে পরিচয়। নলিনী তখনই স্কুলের হীরো, (hero), ফুটবলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, সবাই তার বন্ধুত্ব কামনা করে। পিরোজপুর স্কুলের এক সহপাঠী বন্ধুর সাহচর্যে বিপ্লবী দলের লোকদের সম্বন্ধে কিছু অনুমান ও অনুভূতি হয়েছিল। তাই সেদিন স্কুলের জিমনাসিয়ামে নুতন দুজন লোককে ছেলেদের সাথে কথাবার্তা বলতে শুনলাম, তখনই মনে হয়েছিল এঁরাও বিপ্লবী দলের কেউ হবেন। কয়েকদিন পর পরিচয় হলে জানলাম শচীন কর গুপ্ত (হীরাদা) ও মহেন্দ্র রায় (মহেন্দ্রদা) ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকের কাজ নিয়ে ভোলাতে বিপ্লবী দলের সংগঠনের কাজে এসেছেন, নলিনীর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। নলিনী সেনগুপ্ত (নলিনীদা) তখন ওখানে কংগ্রেসের কাজ করছিলেন। উনি নলিনীদের বাড়ির সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, নলিনীকে খুব স্নেহ করতেন ও ওর বাড়ির ডাকনাম 'হরি' বলে ডাকতেন, হীরাদা ও মনোজদাকেও ঐ নামে ডাকতে শুনেছি। ওদের বাড়িতে সবার অবাধ যাতায়াত ছিল, নলিনীর বাড়ির দিক থেকে ওর গতিবিধির উপর কোন বাধা নিষেধ ছিল না। সেটা সম্ভবও ছিল না কারণ ফুটবল খেলার জন্য ওকে অনেক জায়গায়

যেতে হত, বাড়ি ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। নলিনীর চরিত্রে একটা অসাধারণ দিক ছিল সেটা ওর inborn superiority। পরেও দেখেছি দাদারা যারা আমাদের উপর অনায়াসে আধিপত্য করতেন তাঁরা নলিনীকে সব সময় সমীহ করতেন। যে সব নিয়ম আমাদের উপর চালু ছিল, নলিনীর বেলা সেটা ছিল না। যেমন রোজ জিমনাসটিকস্ ক্লাবে হাজির হওয়া, সাহিত্যমন্দিরে এসে কাগজ পড়া, বই পড়া বা কখনও কখনও মিটিং-এ উপস্থিত হওয়া।

কিছুদিনের মধ্যেই নলিনীর চলাফেরা, কথাবার্তার ভিতর বেশ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। এমনিতেই অল্পভাষী ও আস্তে কথা বলা ওর স্বভাব ছিল। একটি চোখ কিছু টেরা থাকায় সব সময় বোঝা যেত না কার সাথে কথা বলছে। স্বদেশী গান গাইতে পারত, ওর গলাও ভাল ছিল। কারো সাথে কখনও ঝগড়া বা রাগারাগি করতে দেখি নি। খেলার মাঠে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলত ও খুব সুন্দর ড্রিব্‌ল্ করত। যার ফলে বিপক্ষ দলের লোকের কাছে ওকে প্রায়ই মার খেতে হত। সেজন্য ওকে কখনও মেজাজ খারাপ করতে দেখি নি। খেলার পর বরং যারা ওকে আঘাত করত তারাই ওর কাছে আসত।

ওর মনে সম্ভবতঃ ভয়ডর কিছু ছিল না। নির্ভীকতা ওর সহজাত শক্তি ছিল। নুতনবাজার হয়ে ওদের বাড়ি যেতে হলে একটা খুব বড়, ঘন ও প্রায় অন্ধকার সুপারী বাগানের ভিতর দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হত। এক ভদ্রলোক ঠিক বাগানে ঢোকার মুখেই একটা গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। নলিনী কিন্তু দিন বা রাতের যে কোন সময় ঐ পথেই বাড়ি ফিরত।

আমাদের যে জিমনাসটিকস্ ক্লাব ছিল বৃষ্টি হলেই তাতে জল

কাদা জমে যেত—ঠিক হল বালু এনে জমিতে দিতে হবে তখন স্কুলের পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। এক রাত্রে একখানা নৌকা খুলে নিয়ে খালের পাড়ে বালুর স্তূপ থেকে প্রায় সমস্ত রাত বালু এনে ক্লাবের জমিতে দেওয়া হল। নলিনীকেই তার নেতৃত্ব নিতে হয়েছিল।

মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হল। ফল বেরোলো—দেখা গেল খেলা-ধূলায় মন রেখেও নলিনী ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।

এবারে আমরা বরিশাল বি. এম. কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ও আমরা কলেজ হোস্টেলেই রয়েছি। এখানে ও কলেজ টীমে নলিনীর খেলা দেখার জন্য বেল্‌স্‌ পার্কে ভীড় জমত। সহরে নানা রকমের বন্ধু জুটতে লাগল। সেবার কলেজ স্পোর্টসে প্রথম ম্যারাথন রেস্‌ হল—পাঁচ মাইল রাস্তা দৌড়নোর ব্যবস্থা ছিল—নলিনীই তাতে প্রথম স্থান পেল।

সেই সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছিল কিছু একটা একশনের জন্য সব দলই উদগ্রীব। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের ভিতর থেকে কিছু কর্মী নূতন উৎসাহ নিয়ে একই কর্মপন্থা ঠিক করে কিছু করার জন্য কাজ আরম্ভ করলেন। সেই কর্মধারা আমাদেরও টেনে নিল।

নলিনী হোস্টেলের বাস তুলে দিল। সহরের ফকীর বাড়ি রোডে একটা বাড়ি নেওয়া হল—যাতে বাইরের কর্মীরা এসে আবশ্যক মত থাকতে পারে। নলিনীকে সেটা দেখাশুনা ও চালানর ভার দেওয়া হল। এদিকে পুলিশও সতর্ক হয়ে জানা অজানা অনেককেই ধরে জেলে পুরতে লাগল। আমরা ও অনেক বন্ধুরা ক্রমে পুলিশের জালে আটকে গেলাম। কিন্তু নলিনীকে আটকান সহজ হল না। একবার রাত্রে এক জায়গায় মিটিং হচ্ছিল। পুলিশ জাল শবযাত্রী সেজে সেই বাড়ি ঘিরে ফেলল। একমাত্র নলিনী পুলিশের কর্ডন ভেঙ্গে খালের জলে লাফিয়ে পড়ে পালাতে পারল। পরে হিজলী

ডিটেনস্‌ন ক্যাম্প থেকেও পালাল—চন্দননগরে দিনের বেলা ঘেরাও করেও ওকে ধরতে পারল না। তখনকার ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে ওকে most dangerous person হিসাবে চিহ্নিত করা ছিল। আন্দামান যাওয়ার পথে জাহাজ যখন সমুদ্রে পৌঁছল—পুলিশ স্পেশাল লঞ্চে লোক নিয়ে গিয়ে তখন ওর হাতে পায়ের বেড়ি খুলে দিয়েছিল। পথে মহাসমুদ্রে প্রচণ্ড সাইক্লোন শুরু হল—সব কয়েদীর কেবিনের দরজা খুলে দেওয়া হল—শুধু নলিনী যে কেবিনে ছিল তা খোলা হল না।

বিপ্লবীদের ইতিহাসে ওর জীবনী অমর কাহিনী হয়ে লেখা থাকবে।

সশস্ত্র বিপ্লববাদ ও নলিনী দাস

(১৯২৮—১৯৩২)

কালিপদ দাস

[বরিশালের সন্তান কালিপদ দাস আজীবন বিপ্লবী ছিলেন—প্রথমে যুগান্তর দলে, পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে। বহু বছর তিনি জেলে বন্দী ছিলেন, বহু বছর কাটিয়েছেন আত্মগোপন করে। ১৯৮০র ২৬ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। নলিনী দাসের সঙ্গে কথাবার্তার ভিত্তিতেই তিনি এই প্রবন্ধ লিখে গেছেন—সম্পাদক]

১৯২৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষ চন্দ্রের ভলান্টিয়ার কোরে বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ এই সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। এই কোরে অংশ নিয়ে তারা সামরিক কায়দা-

কানুন আয়ত্ত করা এবং নিজেদের যোগাযোগ সংগঠিত করারও সুযোগ করে নেন। আগামী দিনের সশস্ত্র সংগ্রামের যেন একটা মহড়া হয়ে গেল এখানে। গোপনে কলকাতায় তারা বৈঠক করে সহিংস উপায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নেন। যুগান্তর, অনুশীলন, বি ভি শ্রীসংঘ প্রভৃতি বাংলার বিপ্লববাদী সংগঠন এবং বাংলার বাইরের Hindusthan Republican Party ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এরপর ১৯২৯ সালে কলকাতায় হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে—কলকাতা, ময়মনসিং, বরিশাল, ঢাকা ও চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা এক বৈঠক সিদ্ধান্ত নেন ঃ (ক) যার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ শুরু করা, অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরির মাল-মশলা সংগ্রহ করা। (খ) ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিং ও দক্ষিণ কলকাতায় একদিনে অস্ত্রাগার দখল শুরু করা। (গ) নিজেদের বাড়িঘর এবং আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা এবং একান্ত প্রয়োজনে সরকারী অর্থ বাজেয়াপ্ত করা।

সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা জেলায় ফিরে গেলেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের কাজে লেগে যেতে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজও হয়ে গেল। বরিশালে ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ হলো। চট্টগ্রামে হলো ৩০ হাজার টাকা। কেন্দ্রীভূত সুশৃঙ্খল দল না হলেও এই দলগুলোর একটি শর্ত ছিল। যা কিছু শক্তি আছে তা দিয়েই অবিলম্বে আক্রমণ করতে হবে বৃটিশ শাসক শক্তিকে। কলকাতা কংগ্রেস থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লববাদী দলগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে গড়ে উঠেছিল সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, নওজোয়ান ভারত সভা, কীর্তি কিষাণ পার্টি ইত্যাদি।

কলকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ও পাঁচু লেনে বসে পরবর্তীকালে নলিনী দাস, হরেন্দ্র দাস, শচীন বিহারী বিশ্বাস প্রমুখ বোমা তৈরির প্রচেষ্টা করছিলেন। এঁরা সবাই বরিশালের। নলিনী দাস পালিয়ে বরিশালে চলে যান। আর সবাই অ্যাসিড ইত্যাদি সহ ধরা পড়েন। এদের সহ আরো অনেককে নিয়ে শুরু হয় মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। এই মামলায় সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন প্রমুখের ৬ বছর সাজা হয়। সবাইকে আন্দামানে পাঠানো হয়।

১৯৩০-এ নলিনী দাস, ফণী দাসগুপ্ত বরিশাল গিয়ে দেখেন যে প্রায় সবাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। চরম পুলিশী সন্ত্রাস, আবার কলকাতায় এলেন তাঁরা। দক্ষিণ কলকাতার বিনয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে নানা কষ্টে অনাহারে, অনিদ্রায় দিন কাটাতে লাগলেন। তখনো পর্যন্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয় নি। এঁরা ইচ্ছে করলেন চট্টগ্রাম গ্রুপের সাথে একত্রে কাজ করবেন। মাস্টারদারও তাই ইচ্ছে। সবাই মিলেই কাজ করা হউক। নলিনী দাস, বিনয় রায়চৌধুরী, প্রতুল ভট্টাচার্য ঢাকা গেলেন। পুরানো নেতাদের সাথে দেখা করলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তখন পর্যন্ত অন্যান্য গ্রুপ ধরা পড়ে নি। শুধু বরিশাল গ্রুপ ধরা পড়েছে। ঢাকায় ঘর ভাড়া নিলেন তাঁরা। নলিনী দাসও তাঁদের সঙ্গে, তিনি সাজলেন বাড়ির চাকর। কংগ্রেসী মনোহর মুখার্জী তাঁদের সাহায্য করেন। সেখান থেকে গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিং-এর সাথে দেখা করেন তাঁরা। এরা প্রস্তাব দিলেন : চট্টগ্রামের প্রয়োজন নেই। কলকাতায় প্রস্তুতি নিন যাতে একই সঙ্গে কলকাতা ও চট্টগ্রামে আক্রমণ শুরু করা যায়। ময়মনসিং ও ফরিদপুরেও প্রচেষ্টা চলুক। তাঁরা প্রস্তুতি নেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে বোমা তৈরির সময় একটি বোমা হঠাৎ ফেটে যায় বিকট আওয়াজ করে। একজন বন্ধু সংঘাতিক আহত হন। মাস্টারদা দেখলেন আর দেরি করা যায় না, সব ভেস্তে যাবে তাহলে। তাই বাধ্য হয়ে

নির্ধারিত দিনের ১৩ দিন আগেই তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নির্দেশ দিলেন। নলিনী দাস, ফণী দাশগুপ্ত তখন কলকাতার ফুটপাথে। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ খবর এল বিকেলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। হয়েছে ব্যাপক গ্রেপ্তার।

১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী শিবিরে বিনা বিচারে বন্দীদের ওপর গুলি চলল। এর ফলে ঘটনা স্থলেই শহীদ হলেন তারকেশ্বর সেন, সন্তোষ মিত্র। অনেক রাজবন্দী গুরুতর আহত হন। নলিনী দাসও আহতদের মধ্যে একজন। বন্দীদের দাবীতে আহতদের পাঠান হ'ল রেল হাসপাতালে। বন্দীরাই তাদের সাথীদের সেবা সুশ্রূষা করতে অধিকার পেলেন হাসপাতালে। ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস সুযোগ বুঝে পালাবার জন্য সচেষ্ট রইলেন। পূজোর সময় যখন সুপার ছুটিতে তখন নলিনী দাস নীরেন ব্যানার্জী নাম ভাঁড়িয়ে হাসপাতালে গেলেন। ব্যবস্থা আগেই ছিল। প্রহরারত গুর্খা ওয়ার্ডারদের টাকা দিয়ে—মদের ব্যবস্থা করে দিয়ে তারা যখন মত্ত অবস্থায় তখন হাসপাতালের জানালা দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে আসেন। রাত তখন ২টা, এই পলায়ন গুলি চলার প্রায় একমাস পরে। পালিয়ে বেলুড় হয়ে রাণীগঞ্জের এক বন্ধু দুর্গাদাসের বাড়ি এসে ওঠেন। এদিকে ঐ সময় শৈলেশ মজুমদার, শৈলেশ্বর রায়, মদন এবং ভেতরের বন্ধুদের সাহায্যে মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল থেকে পালিয়ে আসেন ১৯৩১-এর অক্টোবর মাসে দীনেশ মজুমদার। নলিনী দাস তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে পরিকল্পনা করেন ভবিষ্যত কাজের। ব্যাপক সাহায্য দিলেন ২৪ পরগণার সাতকড়ি ব্যানার্জি। আর ভিন্ন ভিন্ন পুরানো গ্রুপ নয়, নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে এবার যাত্রা শুরু। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, ২৪ পরগণাকে এক করে নলিনী দাস শুরু করলেন নতুন কাজের পরিকল্পনা।

১৯৩২ সালের ২৯শে জুলাই আলিপুর কোর্টের দায়রা জর্জ

গালিককে হত্যা করলেন কানাই ভট্টাচার্য (২৪পরগণা) ওরফে বিমল দাশগুপ্ত। ১৯৩২-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী বীনা দাস গুলি করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব থেকে ছোটলাট জ্যাকসনকে। ২য় বার ওয়াটসনকে গুলি করতে ব্যর্থ হয়ে মণি লাহিড়ী, অনিল ভাদুড়ী আত্মহত্যা করেন। বীরেন রায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ওয়ার্টসন গুলিতে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মারা যায় না। সব কটি ঘটনার সঙ্গেই নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার জড়িত ছিলেন। এরা দুইজন ওয়াটসন গুলির case-এর উদ্যোক্তা ছিলেন। ২৪ পরগণার সুরেন চ্যাটার্জিকে একাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রথমবার ওয়াটসনকে গুলি করে অতুল সেন; দ্বিতীয় বার বীরেন রায়। বীরেন রায় এখান থেকে চন্দননগর পালিয়ে যান। দীনেশ মজুমদার, শচীন কর, নলিনী দাস তখন একসঙ্গে চন্দননগরে ছিলেন। এরা পলাতক অবস্থায় চন্দননগরে এক কয়লার দোকান দেন। পেছনে ওঁরা থাকতেন আর সামনে কয়লা বিক্রির জন্য লোক রাখা ছিল। কদিন বাদে বীরেন রায় শচীন কর চলে গেলেন ভূপতি মজুমদারের বাড়ি। নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার সেখানেই রয়ে গেলেন। এদিকে বীরেন রায় ফিরে আসেন! কিন্তু শচীন কর ফিরে না আসায় দীনেশ মজুমদার দুটোর মধ্যে ফিরে আসার কথা দিয়ে তাঁর খোঁজে বেরোন। ফিরে এসে সংবাদ দেন শচীন কর গ্রেপ্তার হয়েছেন।

মাস দুই পর—দুপুর দুটো-তিনটে। এঁদের অনুসন্ধান পেয়ে পুলিশ বাড়িটা ঘিরে ফেলে। আর উপায় নেই। দরজা খুলে গুলি শুরু হয় পুলিশের ওপর। একজন পুলিশ অহত হয়। নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার বেষ্টনি ভেদ করে দৌড়তে আরম্ভ করলেন। বীরেন রায় গেটেই ধরা পড়ে যান। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার Quee (কুঁই) ছিল পিছনের দরজায়। বিপ্লবীদের দৌড়তে দেখে 'ডাকাত'

'ডাকাত' বলে চিৎকার শুরু হয়ে যায়। তুই পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সমস্ত পুলিশ ফাঁড়ি সজাগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত চন্দননগর শহর সজাগ হয়ে উঠেছে। রোমাঞ্চকর ঘটনা। এক-দিকে একদল সশস্ত্র পুলিশ আর একদিকে তু'জন মাত্র বিপ্লবী তরুণ—তুই পক্ষই সমানে গুলি চালিয়ে চলেছে। বিপ্লবীরা ছুটছেন আর গুলির বদলা দিয়ে চলেছেন পথে পথে ফাঁড়ির সামনে গুলি বিনিময়। পুলিশ সুপার দলবল সহ একেবারে সামনাসামনি এসে পড়লেন। বিপ্লবীদের গুলিতে কুঁই সাহেব নিহত হলেন। নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার ছুটছেন উর্ধ্বশ্বাসে। আর পিছন ফিরে চালাচ্ছেন গুলি ধাবমান পুলিশবাহিনীর দিকে তাক করে। তু'জন একসময় আলাদা হয়ে পড়লেন, রাস্তার সংলগ্ন এক জঙ্গলে। দীনেশ মজুমদার আলাদা হয়ে গেল। কোথায় তিনি জানেন না। জল তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সর্বত্র চিৎকার ঃ ডাকাত, ডাকাত। দৌড়তে দৌড়তে ফরাসী চন্দন নগর ছাড়িয়ে নলিনী দাস এসে পৌঁছুলেন ব্রিটিশ এলাকায়। চলতে আর পারছেন না। এক বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। একটু জল চাইলেন। পথচারী বলে পরিচয় দিলেন। বললেন, জ্বর হয়েছে। গৃহকর্তা একটু ভেবেচিন্তে এক রাত্রির জন্য তাঁকে বিশ্রাম নিতে দিলেন। রাত্রে কিছু খেয়ে তাঁকে বাড়ির মালিকের কলাবাগানে পাহারা দিতে হল। টিনে সুতো বাঁধা, সেই সুতো টানতে হতো মাঝে মাঝে। যাতে শব্দ পেয়ে পাখিরা কলাবাগানে ঢুকতে না পারে। রাত ১১টা। কলাবাগানে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ভেসে আসে—গুলি করবেন না। আমরা বন্ধু। বাড়ির মালিকের কণ্ঠ। দেখতে দেখতে ১০-১২ জন লোক নিয়ে সে কলাবাগানে উপস্থিত হল। হাতে তাদের লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল তাদের একজনের হাতে নলিনী দাসের ছবি। বললে—সারা রাস্তায়, স্টেশনে ছবি টাঙানো হয়ে গেছে। ধরবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আর পালাবার

পথ নেই। আমাদের সাহায্য ছাড়া পালাতে পারবেন না।" তারা শুনতে চাইল সব। বিস্মিত হয়ে নলিনী দাস ক্ষণকাল ভাবলেন— বলতেই হবে। আর এদের ছাড়া পালাবার উপায়ও নেই। গ্রেপ্তার অবধারিত। ওদের দিকে তাকিয়ে দালাল মনে হল না। সাহসে ভর করে বলতে থাকলেন তিনি। দেখতে দেখতে চা খাবার এল। যুবকরা তাঁর রিভলবার দেখতে চাইল। নলিনী দাস কোমর থেকে রিভলবার বের করে তাদের দেখালেন। মনে হল, তরুণদলের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তিনি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তাঁকে পালাবার পথ বাতলে দিল। ছেঁড়া গেঞ্জী, লুঙ্গি দিল। বাঁশবেতের সাজিতে পাতা ভরে তাঁর হাতে তুলে দিল। বলল, "এটা মাথায় তুলে নিন। ভাব দেখাবেন গ্রামের চাষী যেন বাজারে চলেছে জিনিস বিক্রি করতে।" খেয়াঘাটের পথও দেখিয়ে দিল তারা। ওপারে নৈহাটি। চারদিকে পুলিশে ঘেরা। বিশেষ করে খেয়াঘাটে। হুগলি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে পৌঁছুলে ফাঁড়ির প্রহরারত পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে তাঁকে থামালো। তখন ভোর ৪॥টা-৫টা। নলিনী দাস বললেন, মেয়ের বাড়ি যাচ্ছেন। দু'ঘা লাগিয়ে দিয়ে পুলিশটা তাঁকে ছেড়ে দিল। নৈহাটি এসে টনক নড়ে গেল তাঁর। আশেপাশে বরিশালের দুজন আই বি ঘোরাঘুরি করছে! হুগলি জেলা অধ্যুষিত চটকলের মিলে কাজের জন্য শত শত শ্রমিকের যাতায়াত। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনিও যাত্রা করলেন—পুলিশ, গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে। পায়ে হেঁটে গেলেন মচানন্দাপুর পর্যন্ত। পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। রাত তখন ১১টা। সেখান থেকে গাড়িতে দৌলতপুর পর্যন্ত। তারপর সেনহাটি। দৌলতপুর কলেজের ছাত্র রাজেনের বাড়িতে গিয়ে রাজেনের বাবা চিৎকার করে উঠলে বাধ্য হয়ে তিনি হাতের রিভলবার দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করে আবার ছুটতে লাগলেন। উঠলেন এসে এক বাড়ি। সেই বাড়ির মালিক পুলিশের দারোগা। ভাবলেন, এখানে কি

থাকা সম্ভব ! ছেলে দেবেন কিন্তু সমর্থক। বাড়িতে বিয়ের সরগরম। খাওয়া-দাওয়া। দেবেন তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নলিনী দাসকে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিলেন। বিয়ের পর দারোগা বাইরে চলে গেলে নলিনী দাস একমাস ঐ বাড়িতে থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন। শরীর তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অনাহারে অনিদ্রায়। ওখান থেকে গেলেন যশোর, হিজলী জেলে গুলিতে আহত শিশির মিত্রের মামার বাড়িতে। তার মামাতো ভাই এম. এ. পাস, কিন্তু উন্মাদ। দেখেই চিৎকার শুরু করে দেয়। যাইহোক, সেখানে রয়ে গেলেন বেশ ক'দিন। তখনি গেজেটে নাম বেরুল— নলিনী দাস ১ম বিভাগে আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই সংবাদে সবাই উল্লসিত। তাঁকে সবাই আদর করলো।

ওখান থেকেই সোজা কলকাতা নারায়ণ ব্যানার্জির ভাড়া বাড়ি ১৩৬|৪|এ, তারপর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক বাড়িতে উঠলেন তিনি। এ বাড়িতে দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখার্জিও আছেন। ১৯৩৩ সাল, জুন মাস। মাত্র একদিন পর। পুলিশ সারা বাড়িটিকে ঘিরে ফেলেছে। আশে পাশের বাড়ির ছাদেও পুলিশ। ৪ তলা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পুলিশের কর্তা হুকুম করল : হাত তুলুন— Hands up ! আর সময় নেই। উত্তরে বিপ্লবী তরুণদের রিভলবার গর্জে উঠল। প্রথমেই গুলি করলেন তাঁরা। ডি. এস. পি. পোলার্ড ও গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর মুকুন্দ ভট্টচার্য বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হয়ে ছিটকে পড়ে গেল। আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন, দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখার্জি। শেষ গুলি নিঃশেষের পর নারায়ণ ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। নলিনী দাস ৩টি ছাদ পার হয়ে গেলেন গুলি করতে করতে। শেষপর্যন্ত তাঁর গুলিও প্রায় নিঃশেষ। অহত অবস্থায় (পায়ে গুলি লেগেছিল তাঁর)

তিনিও শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার হন। বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল নারায়ণ ব্যানার্জি ও তার স্ত্রী শৈলবালা দেবী।

[১৩৬|৪|এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে
গোলাগুলি—১৯৩৩-এর ২২ মে]

মামলায় নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জিকে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামান পাঠিয়ে দেওয়া হল। দীনেশ মজুমদার যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে যেয়ে যেহেতু জেল থেকে পালিয়েছিল তাই তার হল ফাঁসি।....

একটা যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল এইভাবে—এই রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

হিজলী জেল পালানো থেকে সশস্ত্র সংঘর্ষে গ্রেপ্তার

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

নলিনীদাকে (নলিনী দাস) প্রথম দেখি ১৯৭১ এ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়। চেহারা দেখেই মনেই হয়নি এতবড় একজন বিপ্লবী। ছোট খাটো মানুষ অসম্ভব মমতায় ভরা চোখ মুখ, দেখলে ভাল লেগে যায়। তার উপর আমি বরিশালের মেয়ে শুনে নলিনীদা একটু যেন আমায় বেশিই পছন্দ করতেন।

এই সময় বার বার নলিনীদার কাছে শুনেছি তাঁর পুরোনো রাজনৈতিক জীবনের নানান টুকরো টুকরো গল্প একজন মানুষ যার জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে হয় জেলে না হয় আত্মগোপন করে,জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে কোন অসন্তোষ বা হতাশা

দেখিনি। জীবনের শেষ পর্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন বেড়াতে গিয়ে মনে হয় তাঁর জীবন আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রাজনীতিতে তাঁর হাতে খড়ি জীবনের প্রত্যুষেই। ১৯১০ এ নলিনী দাসের জন্ম হয় বরিশালের ভোলাতে। ১২ বছর বয়স থেকেই কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। ১৯২১ কংগ্রেসের অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনে তিনি যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন। তবে অল্প বয়স বলে ১ দিনের সাজা দিয়েই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯২৭-২৮ থেকেই একদিকে কংগ্রেসের দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের অগ্রগতি, অপরদিকে বিপ্লববাদী আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯২৮ এ কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তবে গান্ধীজির বিরোধীতায় তা পাশ হয় না। ফলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তির মধ্যে এক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। বিপ্লবী দলগুলি কিছু একটা করা দরকার মনে করে আবার সংগঠিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতে সাইমন কমিশন বিরোধী মিছিল, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দেশ আবার এক নতুন উন্মাদনায় জেগে উঠে।

১৯২৪ এ নলিনী দাস বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। "দ্বীপান্তরের বন্দী" বইয়ে তিনি লিখছেন "এরপর থেকেই শুরু হয় আমার সন্ত্রাসবাদের পথ পরিক্রমা।" তিনি আবার বলছেন "সেদিন আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। তাই অকৃত্রিম দেশপ্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও বীরত্বের উপর নির্ভর করে আরও অসংখ্য বিপ্লববাদী বন্ধুর সঙ্গে আমিও অগ্রসর হয়েছিলুম ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথে। সেদিন আমাদের এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে ছিল গৌরবপূর্ণ এবং মহিমান্বিত।"

১৯২৯ এ বরিশাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের এক ষড়যন্ত্র করেন বিপ্লবীরা। কিন্তু তাদের অনেকেই মেছুয়াবাজার বোমার মামলায়

জড়িয়ে গ্রেপ্তার হন। এই বিপ্লবীরা একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন 'রক্তে মোদের লেগেছে আজি সর্বনাশের নেশা'। পুলিশ ইস্তাহারটি খুঁজতে এসে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী, সুধাংশু দাসগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে এবং এখানেই একটি কাগজ থেকে আরও অনেকের নাম উদ্ধার করে এক রাত্রে বরিশালে ও কলকাতার প্রায় দেড়শত বাড়ি খানা তল্লাসী করে এবং অনেককেই গ্রেপ্তার করে। নলিনী দাস, ফণী দাশগুপ্ত, অনিল চ্যাটার্জীর প্রমুখর নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল তবে এদের ধরতে পারে না। নলিনী দাস ও অন্যান্যরা তখন যোগাযোগ করেন সত্য গুপ্ত, নরেশ গুহ এবং গণেশ ঘোষদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন জেলায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পুলিশের অতি সতর্কতার ফলে একমাত্র চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ছাড়া আর কোনটাই কার্যকরী হয় না।

এই সময় বিপ্লববাদীরা পরিকল্পনা নেয় একের পর এক অত্যাচারী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার। ১৯৩০'র ২৫ আগষ্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা নিক্ষেপ করেন অনুজা সেন ও দীনেশ মজুমদার। ২৯ আগষ্ট ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল পরিদর্শনের সময় বিনয় বসুর গুলিতে মারা যান লোম্যান এবং আহত হন হডসন সাহেব। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিনয় বাদল ও দীনেশ হত্যা করেন অত্যাচারী সিমসনকে। এরকম ঘটনা তখন প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে আর এ ঘটনা বিপ্লবীদের আরও অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

নলিনী দাস এ সময় পলাতক জীবন যাপন করছেন। বরিশাল থেকে ঢাকা সেখান থেকে কলকাতা। কত রাত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩০'র নভেম্বরে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় তাঁকে নিরাপত্তা বন্দী করে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে এবং পরে হিজলী বন্দী শিবিরে পাঠান হয়।

প্রায় ১৫০ জন বিপ্লবী বন্দী তখন হিজলী বন্দী শিবিরে। চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। উঁচু কাঠের বাক্সের উপর সিপাহী বসে পাহারা দেয়। বন্দী শিবিরে আছেন তখন নলিনী দাস, অনিল চ্যাটার্জী, সন্তোষ মিত্র, শিবশঙ্কর মিত্র, তারকেশ্বর সেন প্রমুখরা। বাইরে তখন বিপ্লববাদীদের কাজকর্ম চলছে পুরোদমে। বন্দী শিবিরে যখনই খবর আসত যে কোন অত্যাচারী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বা অত্যাচারী ভারতীয় পুলিশ অফিসার বিপ্লবীর গুলিতে খুন হয়েছে, তখন বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত। উৎসবের প্রতীক হিসেবে তাঁরা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন। এর জন্য শাস্তিও হয়েছে নানান রকম, তবু তাঁরা দমে যেতেন না।

বন্দী শিবিরে গিয়েই নলিনী দাস পালাবার ফন্দী করতে লাগলেন বন্ধুদের সঙ্গে। পালানো ওখান থেকে খুব কঠিনও নয়। সেপাইদের কাউকে হাত করতে হবে। আর রাতে ওরা পাহারা দেবার সময় তো ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সুযোগে তার কেটে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। বন্দীদের কিছু জিনিষপত্র যেত কমলালয় ষ্টোর্স থেকে। ওখান থেকেই জিনিষপত্রের সঙ্গে তার কাটার কাঁচিও চলে এল।

ইতিমধ্যে বন্দী শিবিরে ঘটে গেল এক মারাত্মক ঘটনা। আর্মস ইনসপেক্টর সেপাইদের ক্ষেপাল বন্দীদের বিরুদ্ধে। সামান্য কারণেই একদিন গুলি চলল বন্দী শিবিরে। গুলির আওয়াজে যে যেখানে ছিলেন দৌড়ে এলেন। ততক্ষণে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের গুলি লেগে প্রচুর রক্তপাত শুরু হয়েছে। এলোপাথাড়ি গুলিতে আরও বেশ কয়েকজন আহত। উত্তেজিত নলিনী দাসকে আহত শিবশঙ্কর মিত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বন্দীরা ক্ষিপ্ত। কোন আপোষ নেই। এর প্রতিশোধ চাই। জেলের ডাক্তার

বেকারকে ডাকা হল। তিনি রাত আড়াইটেয় এলেন। সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেন ও আরও ৩৮ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার আগেই মৃত্যু ঘটেছে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের। রাত্রে বন্দীরা সুভাষ বোসের কাছে চিঠি পাঠালেন সমস্ত ঘটনা বিবৃতি করে। পরের দিনের কাগজে বড় বড় করে সংবাদ ছাপা হল। সমগ্র দেশ শোকে, ক্রোধে ফুঁসতে লাগল।

নলিনী দাস অনুমতি নিলেন আহতদের শুশ্রূষা করার। রোজ কড়া প্রহরায় তিনি ও তাঁর কয়েকজন সাথী হাসপাতাল যেতেন। এইখানেই নেপালী দারোয়ান ও পাহারার লোককে মদ মাংস খাইয়ে নলিনীদা হাত করলেন। তারপর একদিন হাসপাতাল থেকে আর ফিরলেন না। হাসপাতালের জানালা দিয়েই পালালেন তিনি ও তাঁর বন্ধু ফণী দাসগুপ্ত। বন্দী শিবিরে হৈ চৈ, ততক্ষণে তাঁরা ট্রেনে হাওড়া বেলুড় হয়ে রাণীগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়িতে এসে উঠেন। প্রায় একই সময় মেদিনীপুর জেল থেকেও পালিয়ে আসেন দীনেশ মজুমদার।

নলিনী দাস তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা করেন। নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার, শচীন কর— এরা তখন চন্দননগরে পলাতক জীবন যাপন করছেন। কিন্তু ২।৩ মাসের মধ্যে পুলিশ খবর পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে। নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার দরজা খুলেই গুলি করতে শুরু করেন। একজন পুলিশ আহত হয়। তাছাড়া ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশ এত হকচকিয়ে যায় যে সেই সুযোগে নলিনী দাস ও দীনেশ মজুমদার গুলি করতে করতে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে ছুটতে থাকেন। পুলিশ খবর পাঠিয়ে দেয় সর্বত্র। রাস্তায় বার বার এরা পুলিশের খপ্পরে পড়েন কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসে ভর করে গুলি করতে করতে পালাতে থাকেন। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন।

নলিনী দাস দৌড়তে দৌড়তে আশ্রয় নিলেন এক বাড়িতে। এক রাতের জন্য গৃহকর্তা থাকতে দিলেন তবে বাড়িতে নয় বাগানে। অনেক রাতে কয়েকজন লোকজন নিয়ে গৃহকর্তা এলেন সেখানে। চীৎকার করে বললেন আমরা বন্ধু, গুলি করবেন না। বিশ্বাস করে নলিনী দাস তাঁদের কাছে সব বললেন। তাঁরাই তরকারী ওয়ালা সাজিয়ে তাঁদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বন্ধুর বাড়িতে তাঁর মায়ের সাহায্যে ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে আবার এলেন কলকাতায়।

এবার সোজা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়িতে। বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন নারায়ণ ব্যানার্জী। এখানেও স্বস্তি নেই। পুলিশ খোঁজ পেয়েছে। নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখার্জী সবাই একসঙ্গে আছেন। বাড়ির চারপাশ এমনকি ছাদ পর্যন্ত পুলিশে ভর্তি. দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। ডি. এস. পি ও আই বি পুলিশ মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য আহত হয়। নলিনী দাস গুলি করতে করতে এ ছাদ থেকে ও ছাদ করে তিনটি ছাদ পার হলেন। কিন্তু তাঁর গুলিও শেষ। আহত অবস্থার এবারে তিনি ধরা পড়লেন। তার পরে শুরু হয় তাঁর দীর্ঘকাল আন্দামানে বন্দী জীবন।

১৯৩৩-র ২৩ মে তারিখের স্টেট্সম্যান পত্রিকায় খবরটির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।…

…One of the men Das then made an amazing attempt to escape, climbing out ove.r the verandah. He was seen from the street ascending one of the thin supporting pillars of the verandah roof making his way over a balustrad to the main roof

of the building 60 feet below into the street, but with extraordinary agility he accomplished the feat.

Meanwhile news of the attempt to escape reached Mr. R. C. Pollard who at that moment was inside the building. He set off in pursuit and gained the roof. Das opened fire on him, but the bullet wert wide, ad Mr. Pollard Secured him."

আন্দামান জেলেই নলিনীদা কমিউনিস্ট হন। জীবনের সায়াহ্নে যখন স্মৃতিচারণ করছেন তখন লিখছেন "তখন আমরা বুঝিনি, মজুর কৃষক মেহনতী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রেণীভিত্তিক এই সমাজে আমরা কোন শ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রাম করছি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে কোন সমাজ-ব্যবস্থা আমরা কায়েম করতে চাই, তাও ছিল আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অতিবিপ্লবী সেজে জীবন বিসর্জন দিলেই যে স্বাধীনতা আসে না, সামাজিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয় না, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা যায় না, এসব কথাও সেই অন্ধ আবেগ আর উন্মাদনাময় দিনগুলিতে আমরা ভেবে দেখার তেমন কোন অবকাশ পাইনি। ...এই আন্দামানেই ঘটেছিল আমাদের মত অসংখ্য মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীর জীবনে নব রূপান্তর।"

সেই ১৯২৪-এ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা থেকে আমৃত্যু নলিনী দা সমস্ত দেশের জন্যই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেলেন। নিজের সঙ্গে দেশকে, দেশের মানুষকে এমন একাত্ম করে ফেলেছেন, তাই কোনদিন তাঁর শুধু নিজের জন্য ভাববার অবকাশও হয়নি। এমন এক অসামান্য বিপ্লবীর ভালবাসা পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

বিপ্লবী নলিনী দাসের সহকর্মী হিসাবে

সুধাংশু সেনগুপ্ত

[এই প্রবন্ধের লেখক ফণী দাশগুপ্ত, নলিনী দাস প্রভৃতি প্রখ্যাত বিপ্লবীদের সাথে বরিশালের সিঙ্গাগ্রামে একটি স্বদেশী ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। ঘটনাটি ঘটে ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস হিজলী জেল থেকে পালানোর পরে, তাঁদের আত্মগোপনের অবস্থায়। এই ডাকাতিতে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই পরে গ্রেপ্তার হন ও বিচারে অনেকেরই দ্বীপান্তরের সাজা হয় তাঁরা সেলুলার জেলে কারারুদ্ধ হন। এই লেখক তাঁদের অন্যতম।

একটি বৃহত্তর রচনার এটি অংশবিশেষ। এতে সিঙ্গা ডাকাতি ও এই মামলার বিচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে।]

আমি এখন 'গৈলা'য় আছি। যতটুকু কাজ করা সম্ভব, আড়ালে থেকেই করি। একদিন আমি 'গৈলা সেবাশ্রম' নামে একটি আশ্রমে গিয়েছি। তখন সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু দু'জন অপরিচিত মানুষকে লক্ষ্য করি। আর একটু কাছে যেতে বুঝি, একজন আমার পূর্ব-পরিচিত ফণী দাশগুপ্ত ও পরে জানতে পারি অন্যজন নলিনী দাস। সেই প্রথম আমি বিপ্লবী নলিনী দাসকে দেখি। যাইহোক, একদিন তিনি আমার জেঠতুতো দাদা'র (নক্ষুদা) বাড়িতে ডেকে পাঠান। কাছে যেতেই তাঁরা মিষ্টি ব্যবহারে ও কথাবার্তায় অনেক-

কিছু বলেন। আমার দাদার সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলেন। আমি অভিভূত হই। আমার বয়স তখন অল্প। তাঁরা দু'জনেই আমার থেকে অনেক বড়ো। তাছাড়া বিপ্লবী হিসাবে তখন কত নাম তাঁদের! তাই পরবর্তীকালে দু'জনকেই দাদা বলে সম্বোধন করি। যাইহোক, একসময় নলিনীদা আমাকে বলেন, 'আজ তোদের বাড়িতে রাত্রিতে যাব। তুই থাকিস।' তারপর বসতে বলেন। বসতে গিয়ে অস্বস্তি লাগাতে উঠে দাঁড়াই, সঙ্গে সঙ্গে বলি আমি আসছি।··· তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, বিছানার নীচে একটা রিভলবার আছে, সরিয়ে বসো। ···আমি অবাক হই! কি করে বুঝলেন উনি!

যাইহোক, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি এলেন। নলিনীদা, ফণীদা ও আমি ছিলাম সেই সময়। আজ এতদিন পরে মনে নেই কি কি কথা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন আমাদের গোটা বাড়িটা (অর্থাৎ আমার মা, বাবা, ভাই, বোন) দেশের সেই সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মা'কে চিরকাল দেখেছি, গভীর মমতায় আমার ও দাদার দেশের জন্য এইসব কাজকে নীরব সমর্থন করতে। আর বাবা যদিও নামকরা ডাক্তার ছিলেন, তবু আদর্শগত প্রশ্রয় ছিল।

এর পরেই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। অথচ সেদিন জানতাম না কোথায় কি করতে যাচ্ছি। সেদিন গভীর রাত। বাইরে ঝড় ও বৃষ্টি। একে একে পথে বেরিয়ে পড়লাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জনপথে বেরিয়েছি। লক্ষ্য—মহিলাড়ায় দ্বিজেন দাশগুপ্ত'র বাড়ি। একে একে নলিনীদা, ফনীদা, ভবরঞ্জন, পতিতুণ্ডি ওরফে মান্তুদা ও আরো কয়েকজন জড়ো হলাম। সেখানে গিয়ে ঠিক হলো সিঙ্গা নামে গ্রামে অর্থ সংগ্রহের জন্য এক

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির বাড়ি ঘিরে ফেলে ধনরত্ন লুঠ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, দলের কাজকর্মের জন্য বা আগ্নেয়াস্ত্র কিনবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হতো। আর সেইভাবেই কোন কোন এলাকায় বিশেষ বিশেষ বাড়ি বেছে নেওয়া হতো। এমনও হয়েছে—সেইসব বাড়ির বিশেষ ব্যক্তি ইংরেজের দালাল বা আমাদের বিরোধী। যাইহোক, একসময় আমরা রাত্রিবেলায় ওই দ্বিজেন দাশগুপ্ত'র বড়িতে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত্রির অন্ধকারে ওই দুর্যোগের মধ্যেই সিঙ্গার ওই বাড়িতে পৌঁছুলাম। কয়েকজনকে আহত করতে হলো। সে এক নাটকীয় পরিস্থিতি। বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে···কান্না···চিৎকার ও তার মধ্যেই ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাসের হুঙ্কার। কারণ গৃহস্বামী কিছুতেই লুক্কায়িত অর্থভাণ্ডারের খবর দেবে না। শেষে আমাদের মধ্যে একজন যখন একটি ঘুমন্ত শিশুকে হাতে তুলে ছোরার আঘাতে কেটে ফেলবেন বলে ভয় দেখালেন তখন তাড়াতাড়ি ওই শিশুটির মা অর্থভাণ্ডারের খবর দিয়ে দিলেন।

এদিকে ঘরের মধ্যে যখন ওই কোলাহল ও কান্না, তখন একজন বেশ বিচক্ষণ ও অভিজাত মহিলা অন্যসব মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভয় নেই, এরা স্বদেশী ডাকাত। এরা মেয়েদের গায়ে হাত দেবে না! সবাই চেঁচাতে লাগল। আর ওই চেঁচানির ফলে পাড়া-পড়শী ও গাঁয়ের আরো সবাই জড়ো হতে লাগল।

এদিকে বাইরেটা আগলানোর ভার ছিল ফণী দাশগুপ্তর ওপর। বাড়িটা একটা উঁচু জমির ওপর। তার চারপাশে খাল। আর বাড়িটার একমাত্র প্রবেশপথ ওই খালের ওপর একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর। সেই প্রবেশপথ আগলানোর দায়িত্ব ফণীদার। ফণীদা মুহূর্তে দেখতে পেলেন, গ্রামের চৌকিদার তাঁকে লক্ষ্য করে একটা ধারালো বল্লম ছুঁড়লে। কিন্তু ভাগ্য ভালো, ফণীদার কানের পাশ দিয়ে

সেটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। ফণীদার অব্যর্থ নিশানায় তাঁর হাতে ধরা পিস্তলের গুলিটা চৌকিদারের কপালের মাঝখানে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। বেগতিক দেখে সবাই গা ঢাকা দিল। ...পরে থানায় রিপোর্ট হওয়ায় পুলিশ আমাদের পিছু নিল। সেদিনই ফণীদা ও নলিনীদা ঠিক করলেন, তাঁরা একসঙ্গে থাকবেন না।

* * *

[এরপার ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস আলাদা হয়ে যান ও অনেকেই গ্রেপ্তার হন। কিন্তু পুলিশ নলিনী দাসকে ধরতে পারে নি। তিনি পরে ১৯৩৩ সালের অগাস্ট মাসে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে পুলিশবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে ধরা পড়েন।]

বিচারের আগেই বরিশাল জেল থেকে duplicate চাবি তৈরি করে আমরা পালাবার চেষ্টা করি, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফণী দাশগুপ্তকে রাখা হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ও আমাকে পাঠানো হয় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। ইতিমধ্যে ফণীদা ও বিপ্লবী সুরেন দত্ত ওই জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেন এবং পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে জেলের প্রাচীরের কাছে ধরা পড়ে যান। তার ফলে সেই সময় তাঁর (ফণী দাশগুপ্ত) ওপর অমানুষিক অত্যাচার হয়। ফলে তিনি প্রায় পাগল হয়ে যান এবং তাঁর অঙ্গহানির মত হয়।

যাইহোক, বিচারের ফল বেরোয়। সেটা ১৯৩২-এর September মাস। Special Court-এর বিচারে বিচারক ছিল একজন ইংরেজ। নাম তার T. H. Elis ICS এবং date of Judgement ছিল 12-12-32. সিঙ্গা ডাকাতি কেসে সকলেরই বিচার হয়। বীণা দাশগুপ্তর identification-এ arms and Explosive act-এ আমার সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং ডাকাতি ও খুনের মামলায় ফণী দাশগুপ্তর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বেকসুর খালাস পায় সুরেশ ও মন্মথ। আর ননী দাশগুপ্তের ১০ বছর জেল হয়। প্রায় সবাইকেই শেষে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

* * *

শেষে নলিনী দাস বা নলিনীদা প্রসঙ্গে একটা কথা বলেই শেষ করব। ১৯৩৫-এ আন্দামানে থাকাকালীন তাঁর প্রচেষ্টাতেই communist consolidation গড়ে ওঠে। আমৃত্যু তিনি কি যুক্ত বাংলায় বা পরে পূর্ব পাকিস্তানে ও সর্বশেষে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বহু সম্মানিত নেতা ছিলেন। এই অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়ে কলকাতায় এসে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুতে একজন আদর্শ চরিত্রের বিপ্লবীকে আমরা হারালাম।

মানব প্রেমিক নলিনীদা

কমলা দাস

কাছ থেকে যখন নলিনী দাসকে দেখবার সুযোগ পেতাম অবাক হয়ে যেতাম তাঁর সহজ সরল অমায়িক ব্যবহারে, আমি যদিও তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলাম না। তাঁকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পাই ১৯৪৬ সালে। বন্দীরা যখন আন্দামান থেকে ফিরে আসেন, আমি তখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের সম্বর্দ্ধনা জানানো হচ্ছে। আমি সে অনুষ্ঠানে যেতে পারছি না। ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবীদের প্রতি ছিল আমার প্রবল আকর্ষণ। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য কত আন্দোলন করেছি। অথচ আমার এ আগ্রহের কথা বোধহয় আমার স্বামী

কমরেড সুশীল দাস নলিনীদাকে বলেছিলেন। দু-একদিন পরে একদিন বিকালে নলিনীদা হাসপাতালে আমার শয্যাপার্শে। আমি কখনোও কল্পনাও করতে পারিনি তাঁর এখানে আসবার কথা। আমি তাঁকে দেখিওনি। শুধু নামেই পরিচয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন আপনজন হয়ে উঠলেন। সুস্থ হওয়ার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। কত কাজ তোদের সামনে। স্বাধীনতার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দেশ জুড়ে চলছে উত্তাল তরঙ্গ। এখন তো শুয়ে থাকবার সময় নাই বোন। কি আন্তরিকতা কথায়। যেন সমস্ত অন্তর ভরে যায়। ওঁরা চলে গেলেন। আমি চোখ বুজে শুয়ে থাকলাম। অদ্ভুত একটা আনন্দের অনুভূতি নিয়ে।

নলিনীদার জীবনের বিরাট একটা সময় জেলেই কেটেছে, না হয় আত্মগোপন করে নানা বেশে, নানা দেশে। অথচ বাইরে কি সহজ সরল সাধারণ ছিল তাঁর ব্যবহার। মনেই হতনা অতবড় একজন বিপ্লবী তিনি। এই সময় দু-একবার আমাদের দেশের বাড়িতে মিটিং করতে গিয়েছেন, রান্না ঘরের দরজায় গিয়ে মার সাথে কথা বলতেন। ছোট একটি ভাই ছিল, তার জন্য একটু কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। সকলের কুশল প্রশ্ন করতেন। তারপরে অনেকরাত্র পর্যন্ত মিটিং করে ভোর না হতে চলে যেতেন।

দেশ ভাগ হবার পর, পশ্চিম বাংলায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো আমাদের। এদেশ ছাড়বার পূর্বে দেখা হল নলিনীদার সাথে। দেশের এই হালচাল আর মানুষের এই চরম অবমাননা, আর দুর্দশা দেখে যেন কেমন হয়ে গেছেন। বেদনার্ত কণ্ঠে বল্লেন, কমল তোমরাও কি চলে যাবে ? যেওনা এদুর্যোগ একদিন কেটে যাবেই। স্বাধীনতার জন্য বাংলার মানুষের কি প্রচণ্ড আত্মত্যাগ। তা কখন বৃথা হতে পারে না। নতুন করে বাংলাকে আবার আমরা গড়ে তুলব। ইংরেজের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আর কংগ্রেসের আপোষের মনোভাবের মাসুল অনেকদিন

ধরে দিতে হবে। ডান হাত খানা শক্ত মুঠি করে বল্লেন "এহাতে অনেক অস্ত্র ধরেছি, আবার ধরতে হবে। তোমরা তরুণ সমাজ, তোমরাইত ভবিষ্যৎ। সাহস হারিও না, বিশ্বাস হারিও না।

কলকাতায় এসে আমরা থাকতাম মুরারী পুকুরের একটা পরিত্যক্ত বাগান বাড়িতে। খুবই কষ্ট করে থাকতে হোত। কিন্তু এই বাড়িটায় একদিন এসে নলিনীদা খুব খুশি। বল্লেন এবাড়ির পরিচয় জান? একদিন এই পরিত্যাক্ত বাড়িতে বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল, কত বীর বিপ্লবীর পদ চিহ্ন আঁকা রয়েছে এর মাটির সাথে। বহুদিন পরে ছোট বোনটিকে কাছে পেয়ে যেন কত আনন্দ তাঁর। অনেক্ষণ গল্প করলেন। চা খেলেন। পরিচয় পত্র লিখে দিলেন। এপার বাংলার পার্টির সাথের যোগসূত্র করে দিলেন নলিনীদা।... যাওয়ার পূর্বে বল্লে চলি বোন। কাজ আরও বেড়েছে। তোমরা এপার বাংলার সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য কাজ করে যাও। আমরাও ওপার বাংলায় কাজ করে চলেছি, ইংরেজ, কংগ্রেস আর দলীয় নেতারা দেশটা ভাগ করতে পারে কিন্তু অন্তরতো ভাগ করা যায় না। কাঠের সিড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নলিনীদা। অনেকক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকলাম।

নলিনীদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর সংগ্রামী জীবন, দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ, কমরেডদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা—ভবিষ্যতের সংগ্রামী মানুষের চলার পথে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। রক্তিম অভিবাদন জানাই আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় কমরেড নলিনীদাকে।

রাকুদিয়ায় কি ঘটেছিল

(মূলত কমরেড ফণী চক্রবর্তীর প্রদত্ত
রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখা)

বাবুগঞ্জ থানার রাকুদিয়া গ্রাম, যেটি উজিরপুর গ্রামের প্রান্তবর্তী এখানে একবার একটি গোপন সভা থেকে নলিনী দাসসহ কয়েকজন কৃষক আন্দোলনের আত্মগোপনকারী সংগঠক ধৃত হন এবং বাস্তবেই মৃত্যুমুখ থেকেই সেবার কোনোক্রমে ফিরে আসেন। ঘটনাটি ঘটেছিল এইরূপ—

১৯৫০ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে রাকুদিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত কৃষক এলাকায় কৃষক আন্দোলন সংগঠনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকজন জেলা নেতা ও কর্মীর কয়েক দিনের একটি গুপ্ত সমাবেশ বসে। প্রায় ঐ সময়ই প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে ব্যাপক বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। জেলার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা অমৃত নাগ ঠিক এই সময়েই তাঁর গোপন আস্তানা থেকে পার্টির গোপন কেন্দ্রে যাওয়ার সময় পথে দাঙ্গাকারীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। কমরেড ফণী চক্রবর্তী ঐ সমাবেশ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দাঙ্গার পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁকে দাঙ্গাবিরোধী প্রচারপত্র বের করা এবং প্রচার সংগঠন করার জন্য গোপন বৈঠক আক্রান্ত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ওখান থেকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পথে তিনিও দাঙ্গাকারীদের হাতে ধরা পড়েন কিন্তু কোনোরকমে এড়িয়ে যেতে পারেন।

যখন বৈঠক দাঙ্গাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন বৈঠকে

পনরো-ষোলো জন সংগঠক উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় অনেকেই সরে পড়তে সক্ষম হন। কিন্তু আটক হন হীরালাল দাশগুপ্ত (প্রয়াত), নলিনী দাস (প্রয়াত) হিরণলাল ভট্টাচার্য, হরিপদ মজুমদার, নজুমুদ্দীন ফরাজী (প্রয়াত) কালু মিস্ত্রী।

তাদের খুন করবার উদ্দেশ্যে প্রহার করতে করতে উজিরপুরের দিকের নদীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন নলিনী দাসেরই উপস্থিত বুদ্ধিতে বন্দীরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল স্বভাবতঃই এদের প্রায় প্রত্যেককেই হত্যা করা। কিন্তু যে লোকগুলি এলাকার সাধারণ মানুষদের আমলে যথেষ্টই প্রিয়পাত্র, উপকারী মিষ্টভাষী সৎ—হঠাৎ তাদের খুন করাটাও অত সহজ ছিল না, দাঙ্গাকারীদেরও কারুর কারুর মনে খানিকটা দ্বিধা ভাব ছিল। নলিনী দাস ঐ বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে এটা অনুমান করতে পেরে···স্থানীয় পার্টি সমর্থক যে দুই-একটি মুসলমান যুবক, তাদের ভয়াবহ মার থেকে বাঁচাবার জন্য পাশে পাশেই ছিলেন, তাঁদের তিনি ফিসফিস করে বলেন—আমার নামে দু'হাজার টাকা, হিরণের নামে পাঁচশো টাকা, ধরতে পারলে এবং অন্য কারুর কারুর নামে হয়তো পুরস্কার ঘোষণা করাতো আছেই তবে আমাদের মেরে ফেলে কি লাভ? থানায় গিয়ে জমা দিয়ে দিলেই তো অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। কথাগুলি দাঙ্গাকারীদের মনে খুব দাগ কাটে। তখন উজিরপুর থানা একেবারে নদীর ওপারেই হওয়ায় ঐ থানাতেই এদের নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করা হয়। সেখান থেকে তাঁরা বরিশালে প্রেরিত হন. এইভাবে তাঁরা বেঁচে যান।

সদরে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। হিরণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়, অন্যদের বিরুদ্ধে দুটি করে। মামলাগুলি ছিল মূলত, "Arms Act" লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নিয়ে। কেস সাজাবার ব্যাপারে বাবুগঞ্জ ও উজিরপুর—দুই

থানার মধ্যে ঝগড়া ও দুই থানার মস্তানদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে মামলাটি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। "Arms Act" লঙ্ঘনের অভিযোগ থেকে সবাই মুক্তি পান। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সকলের দশ বৎসর করে সাজা হয়। হাইকোর্টে আপিল করলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকেও সকলকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু হিরণ ভট্টাচার্যকে তিন বৎসরের সাজা ভোগ করতে হয়।

মামলায় খালাস হওয়ার সাথে সাথে হীরালাল দাশগুপ্ত, নলিনী দাস এবং নুজুমদ্দীন ফরাজীকে বিনা বিচারে "Safety Act"-এ আবার জেলে পোরা হয়। পরে হিরণ ভট্টাচার্যেরও একই অবস্থা হয়। হরিপদ মজুমদার এবং কালু মিস্ত্রী পুরোপুরি মুক্তি পান।

নলিনী দাস

শান্তিগোপাল ভট্টাচার্য

বরিশাল কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে নলিনী দাসের আবির্ভাব ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি বা শেষের দিকে। এর পূর্বে দীর্ঘকাল তিনি প্রথমে আন্দামান জেলে, পরে বাংলার বিভিন্ন জেলে Pre-reform prisoner হিসেবে ছিলেন। নলিনীদা জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বরিশাল পার্টিতে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। এর কিছুদিন পরেই দেশ বিভাগ হয় এবং পার্টি সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে তার কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও বরিশালের গোটা পার্টি নেতৃত্বই বরিশালে থেকে যান। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জুন মাসের খাদ্য আন্দোলনের পরে এই লেখকসহ পার্টির কিছু কর্মী ধরা পড়েন। তখন দু'একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী পশ্চিম

বাংলায় চলে আসেন এবং পার্টি প্রকৃতপক্ষে বে-আইনী পার্টিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে পার্টির সমর্থকদের এক বিপুল অংশ দেশ ত্যাগ করেছেন। পার্টির ভিত্তি যেহেতু মূলতঃ হিন্দুদের মধ্যে ছিল তাই সেদিন পার্টির ছিল এক দারুন সংকটজনক অবস্থা। নলিনীদা তখন বলতে গেলে প্রায় নবাগত। তবু তিনি অল্প সময়েই এমন কর্ম-ক্ষমতা দেখান যে এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁকে পার্টি সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পার্টির সেই দুঃসময়ে নলিনীদাই ছিলেন পার্টির যোগ্যতম নেতা।

আমি নলিনীদাকে প্রথম দেখি মুক্ত রাজবন্দীর অভ্যর্থনায়। সেই সুবাদেই তিনি দিন কয়েক বরিশালে বাকাল গ্রামে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। সেই অল্পসময়েই যেটা সকলের নজরে আসে তা হচ্ছে তাঁর সকলকে আপন করে নেওয়ার অসীম ক্ষমতা। জেলার বহু পার্টি নেতারাই আমাদের বাড়িতে এসেছেন; কিন্তু কোন নেতাই বাড়ির মহিলা ও শিশু মহলে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেন নি। আমার প্রয়াত পিতা অসিতারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁকে আপন ছেলের মতই ভালবাসতেন। তাঁর কর্মময় জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলিই ছিল গল্পের মত চিত্তাকর্ষক। আমরা ছোট-বড় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বিভিন্ন কাহিনী শুনতাম। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারাই তাঁকে ভালবেসেছেন। আমার মনে আছে যখন দিন দু'এক থাকার পরে তিনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন শুধুমাত্র আমার ছোট ভাই ও বোনই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নি। নলিনীদার চোখ দিয়েও টপ্ টপ্ করে জল পড়ছিল। তিনি শুধু ভালবাসার পাত্রই ছিলেন না— অন্যদেরও তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

নলিনীদাকে এর পরে দেখেছি আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায়। আত্মগোপনের যে কোন কষ্ট আছে তাঁর ব্যবহারে তা কখনও প্রকাশ পেত না। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট নিয়ে তিনি এমন হাস্যপরিহাস

করতেন যে আমরাও কোন কষ্ট গায়ে না মাখার শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমরা তখন B. A. class-এর ছাত্র। গোপন পার্টির নানা বিপদের কথা উঠলেই তিনি আমাদের অভয় দিয়ে তার কোমরে গোঁজা পিস্তল দেখাতেন। আমরা এক অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর আশ্বাসবাণী শুনতাম।

নলিনীদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার মেলামেশার সুযোগ হয় জেলখানায়। ১৯৫৯ সালের মার্চ কি এপ্রিল মাসে আমি বরিশাল জেলে যখন দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ অবস্থায় আছি তখন নলিনীদা আত্মগোপনরত অবস্থায় কয়েকজন কৃষকনেতা ও সাধারণ কর্মী সমেত ধরা পড়েন। তখন বরিশাল জেলে ছেলে বুড়ো নারী সহ বহু কর্মী কারারুদ্ধ। আমাদের সঙ্গে কিছু অ-কমিউনিস্ট বন্দীও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রয়াত সতীন সেন, প্রাণকুমার সেন অন্যতম।

আমাদের জেলজীবনে নলিনীদার আগমন এক নূতন প্রাণের জোয়ার এনে দেয়। স্বভাবসুলভ সরসতা নিয়ে বলতেন—"তোদের আর কোনও ভাবনা রইল না। তিন বেলা খাবিদাবি আর জোর গলায় সরকারকে গালাগাল করবি। পাকাবাড়িতে থাকবি। ফিস ফিস্ করে কথা বলার দরকার রইল না।" জেলে এসেই তিনি কাজে লেগে পড়লেন। আমাদের মধ্যে কিছু কমরেড ছিলেন নিরক্ষর। কিছু ছিলেন সামান্য শিক্ষিত। নলিনীদা এসেই প্রথমে নিরক্ষরদের সাক্ষর করা এবং স্বল্প শিক্ষিতদের শিক্ষার মান উন্নত করার কাজে পড়লেন। যে সমস্ত কমরেডরা ইংরেজী জানতেন তাঁদের উপর দায়িত্ব পড়ল ইংরেজী খবরের কাগজের ক্লাশ নেওয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল যাঁরা ইংরেজী কাগজ পড়তে পারতেন না তাঁদের দেশ-বিদেশের খবর সম্পর্কে অবহিত করা। এই ক্লাশ যাঁরা নিতেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ), শ্রীহিরণ ভট্টাচার্য'র মত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ছিলেন প্রয়াত হীরালাল দাশগুপ্তর মত বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

রাজনৈতিক কর্মী, ছিলেন নলিনীদা এবং আমাদের মত কিছু চুনো-পুঁটিও। নলিনীদা খুব ভাল ইংরেজী জানতেন না। কিন্তু তাঁর ক্লাস যেরকম সরস ও প্রাণবন্ত হত এমন আর কারও তা হত না। তারপর সুরু হল পার্টি ক্লাশ। ভারতের জাতীয় আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর চলল ক্লাশের পর ক্লাশ। ক্লাশের পর হত পরীক্ষা। খবরের কাগজের margin-এ প্রশ্নোত্তর লেখা হোত। অতি অল্প সময়েই কমরেডদের রাজনীতিগত জ্ঞানের মান বেশ বেড়ে যায়। এসব ক্লাশে নলিনীদাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আর তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে কিছু কমরেড সাক্ষর হন এবং কেউ কেউ ইংরেজী ও বাংলা পড়তে ও লিখতে সমর্থ হন।

নলিনীদা আসার অল্প সময়ের মধ্যেই জেলখানায় আমরা ৩২ দিনের অনশন করি। অনশন ভঙ্গের পর প্রতিটি কর্মীর স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি সযত্ন নজর রাখতেন। নানান কৌশল—যেমন বিড়ির বিনিময়ে—তিনি জেলখানার চৌকা (kitchen) থেকে অসুস্থ কর্মীদের জন্য দুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতেন। জেলের সামন্য উপকরণ থেকে নানা খেলাধূলা ও প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করে তিনি জেলখানা মাতিয়ে রাখতেন। খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম তো ছিলই। জেলখানার প্রায় সব খেলাতেই তিনি ছিলেন সেরা। এমন বহুমুখী কর্মদক্ষতা আমি আর কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখেছি কিনা সন্দেহ। এমনকি তাঁকে আমি সামান্য ছুরি দিয়ে বিরাট ফোঁড়া অপারেশন করতে পর্যন্ত দেখেছি ; কারণ রোগী হাসপাতালে যেতে ভয় পায়। আমরা অনেকেই মনে করতাম যে জেলখানাতেই যেন তিনি সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ থাকতেন।

আমরা জেলে থাকাকালীন মুস্‌লিম লীগের মহিউদ্দিন আহ্‌মেদ

ধরা পড়েন। কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন, এ ব্যাপারে প্রয়াত অমিয় দাশগুপ্তের অবদান ছিল প্রচুর। নলিনীদা যখন বরিশাল থেকে রাজশাহী জেলে যান তখন মহিউদ্দিন সাহেব কান্না সামলাতে পারেন না।

নলিনীদা ছিলেন এক বিশাল মাপের মানুষ। অফুরন্ত কর্মশক্তি, অদম্য আশাবাদ, কর্মীদের প্রতি প্রাণভরা ভালবাসা—এই সবের সমন্বয়ে নলিনীদা ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বরিশাল জিলার বহু পার্টি নেতার নিকট সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁদের চেয়ে বড় কিছু নেতাদেরও দেখেছি বা তাঁদের সম্পর্কে কিছু শুনেছি। তাঁদের অনেক গুণ থাকলেও নলিনীদার মতো কেউ কোনোদিন আমাকে আকৃষ্ট করেন নি।

নলিনীদা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৭১-র জুলাই মাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা অনেকে সাধ্যমত সাহায্য করছি বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের তাঁবু, জামা, জলের বোতল, ওষুধপত্র, বই—এক কথায় অস্ত্র বাদে সব রকম সাহায্যই করছি। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র-যুবসংগঠনের শত শত তরুণ কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে একটা নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে আমাদের কয়েকজনের—আমি ও আমার স্ত্রী মঞ্জু, স্বাধীন গুহ, প্রসূন মজুমদার প্রভৃতি। আমাদের বাড়িতে এইসব কর্মীদের তখন নিত্য যাওয়া আসা চলছে।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা ন্যাপের মুক্তিযোদ্ধা আলি হায়দরের সঙ্গে এসে হাজির একজন বয়স্ক ব্যক্তি—পাৎলা, ছোটখাটো

মানুষ। মুখে হাসি ঃ কি গৌতম, চিনতে পার? মাথা নাড়ি। সহাস্যে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন ঃ আমি নলিনী দাস। তোমাকে অবশ্য দেখেছি সেই জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৪৬-এর শেষে, তখন তুমি ছাত্র নেতা। স্মৃতির সমুদ্র ঠেলে ফিরে এল সেই ঝোড়ো দিনগুলি। ১৯৪৬-এর ২৪ জুলাই বাংলার মন্ত্রিসভার মসনদ কাঁপিয়ে বিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর জঙ্গী মিছিল বেরিয়ে সেদিন ঘেরাও করেছে বিধানসভা —জেলের দরজা খুলতে হবে, বীর বন্দীদের ছাড়তে হবে—অনন্ত গণেশের মুক্তি চাই, নলিনী দাসের মুক্তি চাই।

সন্ত্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোরাবর্দি ছাত্র অবরোধকারীদের সামনে এসে বলতে বাধ্য হলেন ঃ আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি…। কথা শেষ হল না। তাঁর হাত থেকে 'মাইক' কেড়ে নিয়ে ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য গর্জে উঠলেন ঃ প্রতিশ্রুতি চাই না, মুক্তি চাই। সমুদ্র গর্জন উঠল ঃ মুক্তি চাই। ১৯৪৬-এর ৩১ আগস্ট মুক্ত হলেন সেই বীর বন্দীরা ১৬ বছর কারাবাসের পর। তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন নলিনীদা।

জেল থেকে বেরিয়েই চলে গেলেন মাতৃভূমি বরিশালে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে। তারপর দেশ ভাগ ও পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের জেলে ৫।৬ বছর বন্দী রইলেন নলিনীদা। ১৯৫৪-তে মুক্ত হয়, আয়ুবশাহীর আমলে আবার ফেরারী, ১৯৭১-এর মার্চের পর আত্মগোপন করে সংগঠিত করছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। জুন মাসে আর ওদিকে থাকা অসম্ভব হওয়ায়, সাময়িক-ভাবে চলে এসেছেন এপারে।

মঞ্জু বরিশালের মেয়ে শুনে নলিনীদার কি আনন্দ! তারপর সেদিনই গভীর রাত অবধি আমরা তন্ময় হয়ে শুনলাম বরিশাল জেলাতে ইয়াহিয়া খাঁর জল্লাদ বাহিনীর তাণ্ডব ও বাংলার নওজোয়ানের মরণজয়ী প্রতিরোধের রোমাঞ্চকর কাহিনী। ছদ্মনামে

নলিনীদার সেই বক্তব্য ছেপে বেরল দিল্লীর নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক New Wave এর প্রথম সংখ্যায়, ১৯৭১ এর ১৫ আগস্টে Defiant Barisal নাম দিয়ে।

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১, চিরতরুণ নলিনীদা চরকির মতো ঘুরেছেন মুক্তিফৌজের ছাউনিগুলিতে বিশেষতঃ ইছামতীর পাড়ে হাসনাবাদের ঘাঁটিতে, যেখানে গেরিলা যুদ্ধের কায়দাকানুন শিখছিল বরিশালের কয়েক হাজার তরুণ আর যে সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন বরিশালেরই সন্তান মেজর জলিল।

এমনই একটি দিনের কথা—নলিনীদার সঙ্গে গেছি এক শিক্ষা শিবিরে। হাজার খানেক নওজোয়ান লড়াই-এর জন্য তৈরি হচ্ছে। নলিনীদাকে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন মেজর জলিল। প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন মুক্তিসেনাদের সামনে। বল্লেন: আমাদের সবাইকে যাঁরা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে পথ দেখিয়েছেন, দাদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কিছু বলতে হল নলিনীদাকেও। পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে একসূত্রে গেঁথে দেবার ডাক জানালেন নলিনীদা। সস্নেহ অভিবাদন জানালেন তরুণ মুক্তি সেনাদের, বল্লেন: সব দলমত একজোট হয়ে মুক্ত করতে হবে বাংলাকে। জয়ধ্বনিতে মুখর হল তরুণ মুক্তি সেনারা। এমনই অসংখ্য শিবিরে গেছেন তখন নলিনীদা।

কলকাতার প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাইলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য। আলোচনা বৈঠকের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও তাঁরই গড়ে তোলা মার্কস ক্লাব। সসংকোচে এলেন নলিনীদা, বল্লেন ঘণ্টাখানেক। সেদিন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থিত সবার মনেই গভীর ছাপ ফেলেছিল।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকাতে আত্মসমর্পন করল পাকিস্তানী সেনাদল বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে। ২৫ ডিসেম্বর মুক্তিফৌজের ছেলেদের ও বন্ধুবর অধ্যাপক আবদুল হাফিজের সঙ্গে আমি, মঞ্জু ও দেবব্রত (মজুমদার) পদ্মাতে নৌকা করে ও পরে চর দিয়ে হেঁটে গেলাম মুক্ত রাজশাহীতে। একসপ্তাহ পরে ফিরে এসে খবর পেলাম নলিনীদা জরুরী তলব করে গেছেন। দৌড়লাম তখনই তাঁর কাছে। নলিনীদা বল্লেন: কালই ফিরছি মুক্ত বরিশালে। সঙ্গে থাকছে আলি হায়দর ও অন্যান্যরা।

এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই তাঁর। ১৯৭২-এর ২৪ জানুয়ারি মঞ্জু ও আমি বাংলাদেশে গেলাম—এবার স্থলপথে ঢাকা। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে গিয়ে দেখি নলিনীদা। কৃষক সভার মিটিং করতে করতে এসেছেন। তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ও বামপন্থী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন। পরদিন আওয়ামী লীগের এক নেতার সঙ্গে দেখা। নলিনীদার কথা উঠতেই বল্লেন: দাদার কোনও তুলনা নেই। জেলে বন্দী থাকুন, ফেরারী থাকুন, আর লড়াই-এর ময়দানেই থাকুন, সবসময়ে মুখে হাসি, আর তাঁর মূলমন্ত্র: দমে যেওনা, লড়ে চল। নলিনীদার এর চেয়ে ভাল মূল্যায়ন আমি জানি না।

The Statesman, tuesday, May 25, 1933, (Page-9)

Fight with Terrorists in Calcutta House.
Revolver Duel after Early Morning Raid.

Police Officer Shot
Escaped Prisoner Captured on Roof-top

Three Bengali terrorists were arrested following an early morning revolver duel in a house in Cornwallis Street, Calcutta, yesterday.

The police surrounded the house where, it was believed, absconders were in hiding. and, on knocking at the door of a room, were met by a fusillade of shots, one of the Indian officers being wounded in the shoulder.

The police returned the fire and eventually one of the men in the room—Nalini Das 'wanted' in connection with the murder of the French Commissioner of police at Chandannagar—made a dash for liberty of the roof, but was captured after an exchange of shots.

Meanwhile, the arrests made is that of Dinesh Mazumder who, after being sentenced tc 20 years, imprisonment following the bomb attack on Sir Charles Tegart in August 1930, escaped from Midnapore Jail.

Refusal to Surrender

Surrendering only after ammunition had been exhausted, two notorious Bengali terrorists and an ex-detenu were arrested in Calcutta just before dawn yesterday, following a revolver duel with police during which an inspector was wounded.

The men were :

Dinesh Majumder, who escaped from Midnapore Jail while serving a 20 year sentence in connection with the attempt to murder Sir Charles Tegart, Commissioner of Police, in Dalhousie Square in August 1930, and who was also 'wanted'

in connection with the murder of M. Quil, Commissioner of police, Chandannagar, in March last.

Nalini Das—a detenue, who escaped from Hijli detention camp, and who is also suspected of being implicated in Quin murder. His house is at Barisal and Jogadananda Mukherjee, an ex-detenu.

The three men had taken up residence at the top of a building at 136/4A Cornwallis St. a modern four-storeyed house in the heart of a Bengali residential district in Shambazar. Their presence became known to the police early in the day and a watch was kept in the vicinity while preparation were being made to secure them,

Later in the evening police officers received orders to be readiness to make a raid, and four o'clock in the morning about fifty officers and men were upon the scene.

Greeted by shot

The house was surrounded and a party of police made their way upstairs examining the flats on the various floors. On arriving at the top floor they knocked at the door of the room occupied by the 'wanted' men. Inspector Bhattacharya approached a window next to the door and commanding a view of the passage where the police were standing. Almost instantly the window was thrust open and a shot was fired from inside the room, the bullet entering the inspector's shoulder.

Then followed an exchange of shots in the confined passage, the position being such that the police could fire into the room only at an angle themselves remaining close to the wall in order to avoid the firing from inside.

Repeatedly the occupants were called upon to surrrnder, but the only response was further revolver shots directed the police.

One of the men, Das, then made an amazing attempt to to escape. climbing out over the verandah he was seen from the street ascending one of the thin supporting pillars of the

verandah roof making his way over a balustrade to the main roof of the building 60 feet below into the street, but with extraordinary agility be accomplished the feet.

Meanwhile news of the attempt to escape reached Mr. R.C. Pollard who at that moment inside the building, He set off in pursuit and gained the roof. Das opened fire on him, but the bullet went wide, and Mr. Pollard secured him.

After his capture it transpired that Das was armed with two revolvers, which were discovered later in the compound of a neighbouring house where, it presumed, Das threw them. One had jammed after the first shot and the other was fully loaded.

Refusal to surrender

Meantime the duel below continued. Mazumdar and Mukherjee stubbornly refused to be taken while their ammunition lasted, and continued to ignore the commands to surrender which were shouted in both Bengali and English.

Bullets whizzed unpleasantly close to the heads of the raiding party, and it was fortunate that the occupants of the room, were unable to get in a directly aimed shot. Had they been able to do so the casualties among the police would probably have been heavy.

The first streaks of dawn were showing in the sky when both men shouted that they would surrender, though it was found that they did not decide upon this course until they had used up all their cartridges. As a sign that they had capitulated, they placed both their revolvers at the foot of the window through which they had been firing so that they were visible to the police. They then opened the door and thrust their hands aloft, calmly submitting to arrest.

The men were taken to the special branch police office in Elysium Row, several other arrests were made and a quantity of documents were taken for examination.

Inspector Bhattacharya was removed to the Medical College Hospital and later transferred to the Police Hospital at Bhawanipore. His condition is said to be not serious.

কমরেড নলিনী দাস

মানবেন্দ্র বটব্যাল

কমরেড নলিনী দাস—ভাবীকালের রূপকথার নায়ক নলিনী দাস। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় যোদ্ধা নলিনী দাস। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা অবিসংবাদিত নেতা কমরেড নলিনী দাস। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা কমরেড নলিনী দাস বাংলাদেশের বহু পরিবারের একান্তজন কমরেড নলিনী দাস।

আমার পিতার কলেজ জীবনের সহপাঠী হিসেবে কমরেড নলিনী দাস আমার পিতৃব্য হলেও তিনি আমার কাছে ছিলেন নলিনীদা। শুধু আমি কেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাজারো নেতা কর্মীদের নলিনীদা'র জীবনপ্রদীপ এত তাড়াতাড়ি নিভে যাবে তা আমরা কেউ কোনদিন ভাবতে পারি নি।

আন্দামানে থাকাবস্থাতেই নলিনীদা সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করে মার্কসবাদী রাজনীতিতে দীক্ষা নিলেন। ১৯৪৬ সালে জেল থেকে মুক্তিলাভ করে শুরু করলেন নতুন রাজনৈতিক জীবনধারা।

১৯৪৭ সালের আগস্টমাসে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে' জন্ম হলো পাকিস্তানের। তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে বহু রাজনীতি-বিদই অবস্থার চাপে পশ্চিম বাংলায় চলে যেতে বাধ্য হন। কারণ তখন পাকিস্তানে চলছে প্রচণ্ড ধর্মীয় উন্মাদনা, গণবিরোধী শাসক-চক্র প্রচার করছে—কমিউনিস্টরা মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি চায়না। তারা ভারতের অনুচর। এমনিতর প্রতিকূল অবস্থাতেও

নলিনীদা তাঁর জন্মস্থান বরিশালে চলে আসেন, কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের ন্যায় নলিনীদা অকুতোভয়ে কৃষক শ্রমিকের মুক্তির মন্ত্র প্রচারে লিপ্ত থাকেন।

শাসকচক্রের ইঙ্গিতে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বরিশাল জেলায় শুরু হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নলিনীদার উপর ঝুলছে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। তবুও তিনি অপরাপর সহকর্মীদের নিয়ে দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছেন। এসময়েই বরিশাল শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরবর্তী রাকুদিয়া গ্রামে ক্ষেতমজুর পার্টি সভ্য কমরেড নজুমদ্দীন ফরাজীর (বর্তমানে মৃত) বাড়িতে কৃষকদের নিয়ে সভা করছিলেন। দাঙ্গাকারীরা তাদের হত্যা করতে উদ্যোগী হলেও নলিনীদা'র তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁরা বেঁচে যান। নলিনীদা, নজুমুদ্দীন ফরাজী সহ অপরাপর কমিউনিস্ট নেতাদের পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়। শোনা যায় পুলিশ কর্মকর্তা নাকি উন্মত্ত জনতাকে বলেছিলেন—'তোমরা এদেরকে জীবিত নিয়ে আসলে কেন?' তারপর মিথ্যা মামলার আসামী। অভিযোগ থেকে মুক্তিলাভ; নিরাপত্তা বন্দীজীবন। মুক্তি পেলেন ১৯৫৬ সালে।

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে দেশে হয়েছে ভাষা আন্দোলন। পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারীরা বাঙালীরা কেন্দ্রীয় সরকারের অপপ্রচারকে প্রত্যাখ্যান করে বাঙালী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫৪ সনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে যুক্তফ্রন্টকে প্রাদেশিক সরকারে অধিষ্ঠিত করেছে। পাকিস্তানের নির্বাচনের দিনও এগিয়ে আসছিল। কেন্দ্রেও মুসলিম লীগের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলেন জেনারেল আয়ুব খান। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। সকল

প্রকারের রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতা কর্মীদের মত নলিনীদা'র আবার শুরু হয় পলাতক জীবন। এঁদের বিরুদ্ধে জারী করা হয় গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। দীর্ঘদিনের মধ্যে এসকল নেতাদের কোন হদিস না পাওয়ায় সরকারী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, আত্মগোপনকারী নেতৃবৃন্দ ভারতে চলে গেছেন।

সরকারীভাবে যখন এমনি অপপ্রচার চলছে—নলিনীদা তখন ছিলেন নাজিরপুর থানার মালিখালিতে। ১৯৫৮ সাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানে থেকেই জেলার কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। অবশ্য নলিনীদা এখানে পরিচিত ছিলেন প্রহ্লাদ মাস্টার বা বুড়া মাস্টার হিসেবে।

এই এলাকাটি ছিল বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার সংযোগস্থল। আর তাই তাঁর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি ও নাজিরপুর, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিবাড়ি এবং খুলনা জেলার বাগেরহাট ও মোড়লগঞ্জ থানায়। গড়ে তোলেন শক্তিশালী কৃষক সংগঠন। গড়ে তোলেন কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী সংগঠন। পার্টির আত্মগোপনকারী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মাঝে মধ্যেই এখানে এসে তাঁর সাথে অবস্থান করতেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দু'একটি সভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৬২ সালে স্বরূপকাঠিতে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলন, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফতেমা জিন্নাহ'র নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তান সংসদ নির্বাচনে প্রগতিশীল প্রার্থী প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শ্রীনীরদবিহারী নাগের নির্বাচন, ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সনে এগারো দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সনে বামপন্থী প্রগতি-শীল প্রার্থীদের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন পরিচালনায়

তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শেষে দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এখানে যুবকদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন। জীবনকে বাজী রেখে তিনি স্বরূপকাঠি থানায় কুড়িয়ানায় অবস্থানরত অতি বামপন্থী (পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি) কর্মীদের সঠিক পথের শিক্ষা দিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু ক্রমশঃই হানাদার বাহিনীর অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ভারতে চলে যান। স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। উল্কার মত এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে ছুটে বেড়িয়েছেন। ভারতে অবস্থানরত তাঁর পূর্বকালের সাথীদেরকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার কাজে সংগঠিত করেন।

দেশের স্বাধীনতার পরপরই তিনি ভারত থেকে বরিশাল চলে আসেন। দেশ ও পার্টি পুনর্গঠনে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতেন। প্রগতিশীল কর্মীদের দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করায় উৎসাহ যোগাতে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ১৯৭৪ সালে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করে বিপন্ন মানবাত্মাকে সাহায্য করার জন্য লেগে যান তিনি। ছুটে বেড়ান বরিশাল ও পটুয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সরকার শহর গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করে। নলিনীদা বরিশাল শহরের সর্ববৃহৎ লঙ্গরখানাটি পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এমনকি নিজহাতে লঙ্গরখানার পায়খানা পরিস্কার করেন। শেষদিকে তিনি ভোলাতে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতা যাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ভোলাতে নিজের পিত্রালয়েই ছিলেন।

দেশমাতৃকা ও দেশের মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ চিরকুমার কমরেড নলিনী দাস কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি দান করে গেছেন দেশের মানুষের জন্য। ১৯৭৮ সনে পিতা

প্রয়াত দুর্গামোহন দাসের নামকরণে সমস্ত সম্পত্তি একটি জনকল্যাণ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তর করে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে দৃঢ়চেতা অথচ সদালাপী নলিনীদা ছিলেন বহু পরিবারের একান্ত আপনজন। ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বা বিয়ের ব্যাপারে নলিনীদার মতামত ছাড়া অনেকেরই চলত না। বহু বিপথগামী ব্যক্তিদের সাথে দীর্ঘদিন আলোচনা করে তিনি তাদের সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। বহু পরিবারের গিন্নীদের রান্না শিখতে হতো নলিনীদার কাছ। কারণ নলিনীদা ভাল পাচক ছিলেন। সার্টিফিকেটওয়ালা চিকিৎসকদের চিকিৎসা লাভের পরও নলিনীদার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ না খেলে অনেকেরই রোগের উপশম হত না। কারণ নলিনীদা ছিলেন একজন ভাল চিকিৎসক। নিজের সাথে ব্যাগটির মধ্যে পার্টির কাগজপত্র, নিজের পোষাক পরিচ্ছদ, প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধপত্র সহ নিত্য ব্যবহার্য সবকিছুই থাকত।

দেশ ও পার্টির কাজে সদাব্যস্ত নলিনীদার শেষ জীবনেও খেলা-ধুলা ও সংস্কৃতির প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল। ভাল ফুটবল খেলা হলে এককালের ভাল ফুটবলার নলিনী দাস চলে যেতেন মাঠে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা একবার তাঁকে সংবর্ধনাও জানিয়েছিল। গণসংগীতের বা দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। ভূমিহীন কৃষকদের উপর ভিত্তি করা একটি নাটক দেখে আমাকে বলেছিলেন গ্রামে চলে যাও। আমাদের দশটা সভার চেয়ে তোমাদের নাটকে অনেক বেশি উপকার হবে। অপরদিকে তিনি সব শিশুদের নিকট ছিলেন প্রিয় জ্যেঠুমনি।

১৯৫৮ সনের পর আত্মগোপন থাকাবস্থাতে নলিনীদা একবার মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর কপালের দীর্ঘ জায়গা কেটে যায়। চিকিৎসার পর সুস্থ হলেও আজীবন কপালের উপরের দাগটি বয়ে

বেড়িয়েছেন। অবশ্য এই ক্ষত চিহ্নটির জন্য তিনি কয়েকবারই গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন। কারণ গোয়ন্দা বিভাগের নিকট নলিনীদা'র যে ছবি ছিল তাতে এরকম কোন ক্ষত চিহ্ন ছিল না। একবার তিনি ঢাকা থেকে খুলনা হয়ে নাজিরপুরে আসছিলেন। মুখ ভর্তি দাড়ি। পরনে একজন মওলানার পোষাক। ঢাকা থেকেই একজন গোয়েন্দা তাঁর পিছু নেয় মাঝে মাঝেই গোয়েন্দাটি একটি ফটোর সাথে মওলানার চেহারা মিলিয়ে নিচ্ছিল কিন্তু ক্ষত চিহ্নটির জন্যই উপমহাদেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। সেই রূপকথার নায়ক শুধু একজন গোয়েন্দাকে নয় সমগ্র দেশবাসীকে ফাঁকি দিয়ে নিজের মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দেশের ও দশের জন্য সর্বত্যাগী এই অমর বীরের দেহটি কিন্তু দেশের মাটি ধারণ করতে পারল না।

'শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত স্মরণে' পুস্তিকায় নলিনী দাস লিখিত

'শচীনদার স্মৃতি' থেকে গৃহীত

স্বর্গীয় ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস ১৯৩১ সালের অক্টোবরে হিজলী ক্যাম্প হতে পলায়ন করেন। এরা বেরিয়ে আসার পর নূতন করে আবার কাজ শুরু হয়। মেদিনীপুর জেল হতে বন্ধুদের পালাবার ব্যবস্থা করা হয়, এই ব্যাপারে বিনয় দাশগুপ্ত, শৈলেশ রায় (মদন) যথেষ্ট সাহায্য করেন। সুশীল দাশগুপ্ত অল্প কয়েকদিনের ভিতরই কলিকাতায় গ্রেপ্তার হয়ে যান। শচীনদা, দীনেশ মজুমদার,

ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস প্ল্যান করে কাজ শুরু করেন। এই সময় যারা প্রাণ ঢেলে আমাদের সাহায্য করেছেন, থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আমরা তখন প্রধানতঃ কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগর, বাঁকুড়া, ধানবাদ, পুরুলিয়া, খুলনা ও বরিশালকে কেন্দ্র বেছে নিয়েছিলুম। তখন ২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় আমাদের নেতৃস্থানীয় বন্ধু ছিলেন সাতুদা (সাতকড়িপতি বন্দ্যোপাধ্যায়), সুশীল চাটার্জী, বিনয় দাশগুপ্ত প্রভৃতি। প্রমোদ বসু, কল্যাণী দাস এদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৩২ সনে তুইবার করে ওয়াটসনের উপর গুলি, গার্লিক হত্যা, ৩০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হতে তুলে নেওয়া, বীণা দাসের স্যার জ্যাকসনকে গুলি করা সম্ভব হয়েছে। চন্দননগরে ছিল শ্রীশদা, অন্নদা পাল ও অন্যান্য বন্ধুরা হুগলিতে শৈলেশ মজুমদার, বিজয় মোদক প্রভৃতি, বাঁকুড়ায় প্রমথ ঘোষ, ডাঃ বাবু, কেরানীবাবু প্রভৃতি, পুরুলিয়াতে বিভূতি দাশগুপ্ত ও তার বোনেরা, বিশেষ করে অরুণ ঘোষ ও তার মা সমস্ত রকম বিপদ মাথায় নিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন।

রাণীগঞ্জের তুর্গাদাস ও অসংখ্য বন্ধুরা এবং বোনেরা এই সময়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। সকলের নাম মনেও নেই এবং দেওয়াও সম্ভব নয়।

চিঠিপত্র

[বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর নলিনীদা কলকাতাতে তাঁর স্নেহভাজন গৌতম ও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সেগুলির মধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও সংগ্রাম সম্বন্ধে থাকত তাঁর তীক্ষ্ণ মতামত। সেগুলির বাছাই করা অংশ পরিবেশন করা হল—সম্পাদক]

[১]

"...কিছুদিন পূর্বে জন্মভূমি ভোলাতে গিয়েছিলুম। কি যে ভালবাসা ও জনগণের উন্মাদনা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছেলেমেয়ে সবাই রাস্তায় নেমে এসেছিল। ছোট্ট শহর, তবু ১৫।২০ হাজার লোকের জনসভা হয়েছিল। ১৪ বছর পরে বাড়িতে খেলুম ও রাত কাটালুম। ইতিমধ্যে বরিশাল জেলার আরও অন্যান্য স্থান ঘুরেছি। হিঙ্গলা—মেহন্দীগঞ্জ থানায় গিয়েছিলুম। রাক্ষসী মেঘনা। হাজার গ্রামকে ধ্বংস করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক নিঃস্ব। এরই মাঝে হয়েছে জনগণের উপর বর্বর ইয়াহিয়ার আক্রমণ।

পাতারহাট, উলেনিয়া, আলিগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরকে ও দুই পাশের রাস্তার সমস্ত বাড়িকে রাস্তার সমস্ত বাড়িকে তারা ধ্বংস করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! ১৫ বছর পর দাদা ও ভাই-এর মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলুম। সবচেয়ে বড় বাড়ি ঐ এলাকার। বিপদের সময় আরো ২০টি পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ইয়াহিয়ার দস্যুরা বাড়িতে ঢুকে সমস্ত লুটপাট করেছে,

লাঙ্গল দিয়ে সমস্ত বাড়ী চাষ করে, বাগানে ঢুকে সঞ্জীব বলে একজন যুবককে গুলি করে, লালি এবং অনিতা নামে বাড়ির দুই বৌ-এর উপর অত্যাচার করে। এই সমগ্র থানায় তারা প্রায় ৩০০ লোককে হত্যা করেছে আমায় দেখে মেয়েরা সব কাঁদছিল। তোমরা সম্ভব হলে এর ভিত্তিতে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা রিপোর্ট পত্রিকাতে দিও।

মাসীমার 'মাতৃমন্দির' ধ্বংসের কথা তো জানই। সাধ্যমত সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাবে। সবাই আমার ভালবাসা জেন।

নলিনীদা"

বরিশাল ২৬-২-৭২

[২]

"...নববর্ষ এল, চলে গেল। কিন্তু এত কাজের চাপ যে তোমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে পারলাম না। মানুষ সর্বত্র জানতে চায়, আমাদের কথা। ধর্মভিত্তিক, প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ তারা শুনছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। অধিকাংশ লোক আপত্তি জানাচ্ছে না, তবে গ্রহণও করতে পারছে না। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখনও রয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে চরম অর্থনৈতিক সংকট। এই অবস্থাতে রাজনৈতিক সংকট যে কত গভীর তা তো বুঝতেই পারছ। এর বিরুদ্ধেই আমাদের জেহাদ, আমাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা। ২৪ বছরের ফাঁক সহজে পূর্ণ হবার নয়।

ভোলা গিয়েছিলাম। ফিরে এসে তোমাদের চিঠি পেলুম। মাসীমা তোমাদের চিঠি ও পাঠানো টাকা সবই পেয়েছে। বর্ষা এসে গেছে। আমাদের ঘর বলতে সবই প্রায় ধ্বংস। মাসীমার স্কুল ঘর তো ধ্বংসস্তূপ। ফের গড়বার চেষ্টা চলছে।

আমার শরীর ভাল নেই, খারাপও নেই। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছি। দেরিতে হলেও সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

নলিনীদা"

২০।৫।৭২

[৩]

"এবার কলকাতা ঘুরে আসার পর হতে একটার পর একটা জিলা কৃষক সম্মিলন—ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি, খুলনা, তারপর ৩টা থানা কনফারেন্স, সর্বশেষ বাংলাদেশ কৃষক সম্মিলন বগুড়াতে সম্পন্ন করে এসে তোমাদের চিঠি লিখছি।

...আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। চাউলের মন ১৩০ টাকা, কোনও কোনও স্থানে ১৪০ টাকা পর্যন্ত। প্রতিটি জিনিসের আকাশচুম্বী দর। চোরাকারবারীরা চালাচ্ছে পারমিটবাজী। ভুভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ডাকাতি, খুন, রাহাজানি প্রতিদিন চলছে। রাজনৈতিক খুনও ২।১টা প্রতিদিন হচ্ছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনৈক্য—রাজনৈতিক মতবিরোধ নিয়ে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত স্বার্থ।

'দ্বীপান্তরের বন্দী' বইটা সম্পর্কে কোনও সমালোচনা শুনলে আমাকে জানাবে। এখানে ঐ বই প্রকাশ করার একটা চেষ্টা চলছে।

চিঠি দেবে নিয়মিত। ভালবাসা জেন।

নলিনীদা"

বরিশাল, ২০-৩-৭৪

[৪]

"বন্ধু সুনীল মুন্সী, মঞ্জু ও তোমার লেখা বই 'এই আমাদের বাংলা' পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এই বইটা 'খেলাঘরের' ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুবই পড়ছে। আমরা বড়রাও পড়ে নিয়েছি। ইতিহাস, ভূগোল ও সহজ-সরল রাজনীতি বুঝার জন্য এই বইটি চমৎকার হয়েছে।

...আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা গত ৩।৪ মাসে আরও চরম আকার ধারণ করেছে। মানুষের কষ্টের কোনও সীমা নেই। রাজনৈতিক সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে আওয়ামী লীগের মধ্যে অনৈক্য, দুর্নীতি ও খাওয়াখাওই। ধর্মের নামে জিগির ও চরম সাম্প্রদায়িকতাও আবার শুরু হয়েছে। আর এই সংকটের মধ্য দিয়েই পথ চিনে আমাদের এগোতে হবে।

এখন মানুষ অনেক সচেতন, তবে ষড়যন্ত্রও সুগভীর। তোমরা যেভাবে পার, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তিদের সাহায্য কর।

সকলকে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা রইল।

নলিনীদা"

বরিশাল ১৪-৪-৭৪

Defiant Barisal !

(Terror and Resistance, April to July '71)

(by a Freedom fighter)

[This report was published in Delhi's New Wave on August 15, 1971 with the following introductory note.

"This report has been brought to us by an outstanding revolutionary leader of Barisal and Bangladesh, who personally organised resistance in that district from April to early July. For reasons of security of the resistance leader, we are unable to disclose his real name, but we are sure that the report that he has brought will renew and strengthen our faith in Bangladesh in Revolt :

Gautam Chattopadhyay."

Now it can be disclosed that this outstanding revolutionary leader of Barisal and Bangladesh was none other than Nalini Das : Editor Nalini Das Smaranika.]

Barisal, the coastal district in south east Bengal, has always been in the forefront of freedom struggle. It has thrown up outstanding national leader like Aswini Dutt and Fazlul Huq. It has given the country hundreds of death defying national revolutionaries. Still later, Barisal in East Pakistan, became a strong hold of the movement for national autonomy. During the elections of 1970. there was a veritable upsurge of Bengalee Nationalism and 'Jai Bangla' was on every lips.

From Ist March, 1971, the great non-co-operation movement started when Mujib gave the call. I have never seen anything

Like this in my whole political life. There was complete 'hartal' and total non-cooperation—from the chaprasi and the chowkidar, to the district magistrate and the police superintendent all joined the movement. Black flags went up everywhere and one slogan was on everyone's lips—independence for Bangladesh.

Then came fateful 25th March and the news of treachery and perfidy by Yahya khan. The stories of mass murder, rape and genocide started pouring in and temper rose in the district of Barisal and Patuakhali. People, especially the youth, irrespective of political affiliations formed Sangram Samitis (Action Committees) everywhere—in villages, in thanas, in sub-division and the districts as a whole.

It would be absolutely no exaggaration to assert that these countless Sangram Samitis, were the Bangla Desh counter-point of the revolutionary Soviets of Russia in 1917—only the context and the stage of revolution being different. These Sangram Samitis weilded effective state power in the districts of Barisal and Patuakhali from say the 7th of March to the middle of April. The district magistrate, the police-officer, the merchants —everyone took their order from the Sangram Samitis who ran the afiairs quite efficiently. At all levels, a national militia sprang up under their control—which later assumed the character of the Mukti-Fouj. The EBR, EPR and police joined this vast national front and fire-arms were duly distributed to to the Mukti-Fouj from the police and EPR bartacks, at the directive of the Sangram Samiti. The armed youth volunteers paraded the streets, prevented looting, checked, high-prices, and generally behaved admirably, as behove revolutionary patriots.

Who manned these Sangram Samitis? Naturally, the the dominant farce everywhere was the Awami League and its cadres. But wherever the NAP or the CPB took initiative in organising resistance, enrolling youth in the Mukti-Fouj and so on, there they too were included in the local or thana Sangram Samitis—sometimes willingly by the Awami League.

sometimes, forced by the logic of event and the pressure of masses, and their own militant rank and file. Old, vereran CPB leader like myself, who came out of over a decade's underground existence were given enthusiastic welcome by all—ordinary people, left-wingers as well as cadres and leader of the Awami League.

Between 12th and 18th April, the Pakistani army came to our districts, after leaving a bloody trail in Dacca Chittagong and Khulna. First came a few aeroplanes, which bombed thc towns of. Barisal and Faridpur from the air, Killing many civilians,

The people and even we had thought that even the fascist army of Pakistan would probably spare Bhola ond other coastel areas of Barisal and Patuakhali, because late in 1970, these areas had been totally devastated by the worst cyclone in our living memory, But the beast did not spare even these areas. On 29th April, Pakistani planes bombed and wronght havoc in Bhola and other major eyclone affected centres in our districts'

Then came massive attack byair, sea and land—at Barisal, Bhola, Jhalokathi, Pirozpur, Natart. Kankhali, Baharipara, Byaskathi and so on. From the air they bombed and machine gunned the civil population. From the rivers, they shellcd civilians from gunboats, And finally came the army, which ravaged town after town and set fire to whole chain of villages. Anybody suspected to be a political worker—Awami League, NAP or Communist—was at once killed and usually killed with the utmost brutality. The sames fate awaited all students and most able bodied youth. for they were suspected to be member of the Mukti-Fouj (and not very wrongly at that !). In the Daihari village, over 150 villagers were massacred. In the Mollarhat thana several thousand Hindus and Muslims perished in almost equal numbers.

In Kirtipasha, several hundred Muslims were praying inside a Mosques. The Pak soldiers surrounded the Mosque, dragged the devotees out into the open and then killed all of

them with machine gun fire. In Lankhali and other places, the Pak soldiers took sadistic pleasute in forcing kids to climb cocoanut trees and then pepper the boys with bullets, enjoying their death agony as they fell down.

Hundreds of teen ager girls—both Hindus and Muslims—were abducted by the Pak soldiers and raped again and again. Almost all the towns, of the two districts are now deserts, with houses destroyed and hundreds of thousands of people taking shelter in village, in forest. and in marshy areas known as 'Beels'. The Iri paddy-crop has been totally destroyed and, 'Aus' not sown at all. The fate of 'Aman' also seems to be precarious, Hunger stalk, the districts, famine does not seem to be far away. People already live on near-famrine rations. Yet not a soul has accepted the Pak rule—resistance continues and spread to ever new area.

I could give countless and varied type of examples, but I shall cite only a few typical cases. After the burning of the town, lakhs of city-dweller took shelter in the villages. Such a batch of over 10 thousand refugees had taken shelter in the village of Kiriana in Barisal District—the refugees from the cities were mostly hindus while the villagers giving them shelter were mostly Muslims. Over a thousand Punjabi soldiers, armed to the teeth with modern weapons attacked the villages, The refugees were taken to a vast Guava-or chard and this was guarded by over 1000 youth—an irregular Mukti-Fouj armed with rifles and grenades. For 3 days, furious battle raged and the Pak army retreated before the heroic resistance of the Mukti-Fouj. A week later they came back in gun boats and shelled the entire orchard. The refugees were able to escape in large number but 500 members of the Mukti-Fouj became martyrs in course of this death-defying sfruggle, Similar heroic resistance was put up by Mukti-Fouj of Kirtipasha, Bhimrul and other centres and their martyrdom shall ever remain eshrined in the heart of countless millions of Barisal and Patuakhali,

Let me also recount the heroic fight put up at taltolli, only 2 miles from Barisal town. Here, the Pak soldiers came in

several steam launches and Mukti-Fouj counter-attacked. In the initial fighting, one steam-launch was destroyed and several scores of soldiers were killed. The Pak army retreated but later on, came back with gun-boats and planes. By bombing, strafing and shelling, they utterly razed to the ground 7 muslim villages. The Mukti-Fouj retreated for the time being but resistance continued.

The policy of wanton terror and genocide pursued by the Pak Military Junta, has totally isolated them. Fven the so-called collaborator are men with divided loyalty, Here are two typical cases. A moulavi, a Muslim League leader who is with the Pak authorities, was walking along the streets of Barisal. A batch of Pak soldiers had arrested a college student a Mukti-Fouj member in fact. The Moulavi knew him quite well : But when the soldiers asked the Moulavi as to who the youth was, he replied : oh, he is a peasant youth, let him go, And the young freedom-fighter escaped to live and fight again.

The other is a more striking incident. I was hiding in a village, sometime in Jnne, Suddenly news came that the eldest son of my host had been arrested by lhe police together with 4 other young men and kept in the police lock-up. It was evening and the military were expected in the village the next monning. The boys were sure to be exceuted. All night. people could hear the boys lustily singing in their, cells, "Karar oi Louha Kabat, Bhenge fel " (Break down the iron gate of the prison) the famous song by Nazrul Islam.

Early in the morning, the splutteriag noise of a gunboat could be heard, down the river. The military were coming. All the villagers, en masse' rushed for the forests and marshy areas. As we were going, those 5 boys came running and joined us. We were jublilant at their frcedom, But how did it happen ? As the noise of the gunboat became distinct, the poliee officer in charge of the lock-up, who was taking his bath then, rushed up and ordered their release, shouting "The

Bastards are coming—let the boys so, or else the butcher will shoot them like dogs." !

On myway to the Indian border, for one whole week, I I marched nearly 150 miles through Barisal, Jessore and Khulna. Everywhere, the word 'Mukti-Fouj' was uttered with love, respect and admiration. One night, in a village in Jessore, as we were resting in a house, looters came. They came with fire-arms both to loot property and abduct girls. We were at our wit's ends because none of us were armed then. Suddenly a great shout could be heard, "Do not be afraid ! We are here, we are the Mukti-Fouj" in a trice, the looters disappeared and a score of teen-agers, all armed with rifles appeared. The squad leader was a Hindu boy, the rest were muslim. They embraced us and told us that there were scores of such squads in that region—over a 100 miles away from the Indian border.

Another incident. Fearing attacks by looter, about a thousand refugees marched towards India through forest, while movable property was left with the driver of a score of bullock-carts, At night when the refugees reached the border, the carter were waiting for them, with their goods intact. All the carters were Bengalee muslims and almost all the refugees were Hindus. As the refugees started crossing the border, the carters shouted. "Brothers, remember us and come back to liberated Bangla Desh !" This was as late as July 13th, 1971.

From March to early July. I have literally rubbed shoulders with lakhs of Bengalees in Barisal, Jessore and Khulna—Hindu and Muslim, students and peasant. All were inspired with a single idea: A simple boatman expressed to me tersely, the feeling of 75 million Bengalees. "We can't live any longer under them—now we must be free." Freedom for Sonar Bangla or death—such is the watchword of literally millions of Bengalees, especially the valiant youth.

As for united front—agreement at the top is no doubt very necessary but the real unity is already being forged in the ranks

of the heroic mukti-fouj. All must unite who are for Sovereign Bangla Desh—and unity must mean unity in action, in fight, in extending, organising and unifying the vast regular and iregular Mukti-Fouj now operating inside Bangla Desh. There is no room there for waverers or doubters, Victory, certainly shall be ours.

[*Reprinted from NEW WAVE, 15 August 1971*]

মার্কসবাদে উত্তরণের ইতিহাস

[নলিনী দাস লিখিত 'দ্বীপান্তরের বন্দী' গ্রন্থ থেকে]

কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের কথা পূর্বেও কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু যা শুনেছি এবং যা পড়েছি মনের মত করে তার একটা দিয়ে নিয়েছি মাত্র। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তখনকার দিনের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী আন্তরিকভাবে বলেছি: আমরাও তো সমাজতন্ত্রবাদ চাই। প্রথমে ইংরেজকে তাড়াতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমাদের গরীব, অনুন্নত ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন দেশের সকল মানুষের দুঃখকষ্ট ঘোচাব, সকল মানুষের সম অধিকার কায়েম করব—এইতো স্বাধীনতা, ইত্যাদি। এই কথাগুলো মুখে বললেও মর্মবস্তুতে তখনও প্রবেশ করতে পারিনি। হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি এর আসল অর্থ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে একটি বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ যে তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ে বিকশিত এবং সমৃদ্ধিশালী হয়, বিজ্ঞানের ছাত্রের মতই যে একে অধ্যয়ন এবং কর্মে প্রয়োগ করতে হয়, তা তখনো বুঝি নি। জনতার দুঃখকষ্টে সীমাহীন বেদনা, নৃশংস জুলুমশাহী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি চরম ঘৃণা, প্রতিনিয়ত পরাধীনতার বৃশ্চিক দংশন, দেশপ্রেমের আবেগ ও উন্মাদনা—মনকে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিকে, মধ্যবিত্ত চেতনাকে তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মজুর-শ্রেণী ও মেহনতী জনতার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদেরই একজন হয়ে ভাবা—তখনও জীবনে স্পষ্ট হয় নি।———

সমাজতন্ত্রের কথাটা খুব সম্ভব প্রথম শুনেছিলাম ছাত্রহিসাবে, ১৯২৬ সালে বরিশাল জেলার নলচিড়া গ্রামে যুব-সম্মেলনে, স্বামী বিবেকানন্দর ভাই ডঃ ভূপেন দত্তের মুখে।

ভারতের রাজনীতি যখন চারিদিক থেকে অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন, ব্যর্থতার ইতিহাস যখন রাজনৈতিক কর্মীদের মনে গভীর নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে পশুর মতো এণ্ডারসনী নৃশংস নিষ্পেষণ জনগণকে যখন পিষে মারছে, চারিদিকে মধ্যবিত্ত গণজীবনে যখন চরম হতাশা বিরাজমান, তখন মজুর-কৃষক মেহনতি জনতার পক্ষে সমাজতন্ত্রের পথই যে একমাত্র মুক্তির পথ— এই চেতনা আমাদের মনে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

আন্দামানে বসে, একেবারে গোড়ার দিকে, বন্ধুদের সাহায্য না পেলেও বৈপ্লবিক জিদ নিয়ে অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়শুনা শুরু করলুম। প্রথমদিকে পড়শুনার ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর মনে হয়েছে, চোখ দিয়ে জল ঝরেছে, মাথা গরম হয়ে গেছে, উধাও হয়েছে রাত্রের ঘুম; তবু প্রতিদিন উন্মাদের মতো পথের সন্ধানে ১৩-১৪ ঘণ্টা করে পড়েছি। এই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট মতবাদ যে একটা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ছাত্রের মতোই অধ্যয়ন করতে হয় এবং জনগনের মাঝে কাজ করে এই বিজ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে হয়, বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ই যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ—তা ক্রমেই বুঝতে শিখলুম। মজুর ও মেহনতী জনতার মাঝে কাজ না করে জনতার কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে, জনতাকে সমাজতান্ত্রিক

চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত না করে, জনতার আপনজন না হয়ে, শুধু চাটুকারিতা আর বড় বড় সমাজতান্ত্রিক বুলি কপচিয়ে সমাজতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দ্বারা বা শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে কত বিপ্লবী বন্ধুকে যে সঠিক রাজনীতি থেকে অনেক দূরে ভেসে যেতে দেখেছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

আজকের দিনে সমাজতন্ত্র বুঝবার ও এগিয়ে যাবার যে সুযোগ এসে গেছে, সেই অতীত দিনগুলোতে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারত না। সবই ছিল নিষিদ্ধ ও বে-আইনী। সোভিয়েত ছিল 'নিষিদ্ধ দেশ ও নিষিদ্ধ কথা।' সেই নির্মম পীড়াদায়ক দিনগুলোতে আমারই পাশে ছিল সুনীলদা-র (চ্যাটার্জী) সেল। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনায় যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তিনি ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং তখন পর্যন্ত উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী। এমন মেধাবী এবং বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনাওয়ালা বন্ধু ক্যাম্পে ও জেলে আমরা খুব কমই দেখেছি। তিনি বলতেন, 'আমি মার্কসবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করে ছাড়ব।' জেলের সর্বত্র তিনি চিৎকার করে বলতেন, 'কমিউনিজম ভুল। ভারতীয় দর্শন সঠিক।' শেষপর্যন্ত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে হঠাৎ তিনিও একদিন কমিউনিস্ট হিসাবে বেরিয়ে এলেন। পরিশেষে একদিন ঘোষণা করলেন, 'মানবমুক্তির একমাত্র পথ হলো—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ—কমিউনিজম'। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গভীর ও আন্তরিকভাবে পড়াশুনা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো : (১) কি কি বিষয়ে পড়াশুনা করব এবং (২) কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়াশুনা করব তা স্থির করা।

দৃষ্টিভঙ্গিগত এই সমস্যার একদিকে রয়েছে কায়েমী স্বার্থে ধনিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে পড়াশুনা করা, যার মূল কথা হলো—জমিদার, বুর্জোয়া অভিজাত শ্রেণীর শাসন-শোষণ স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী এবং

ধর্ম, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি শাশ্বত ও চিরন্তন, এটা প্রতিপন্ন করা।

অপরদিকে গরীব মেহনতী জনতা ও মজুরশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ আমরা কোন শ্রেণীর লোক এবং কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি? শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মানুষ কোনো-না-কোনো শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে চলেছে, সুতরাং আমরা কাদের স্বার্থে কাজ করি, কাদের স্বার্থে কথা বলি সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা।

পড়াশুনা করার ব্যাপারে এই দুটো বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়েছিলুম। গরিবের উপর শোষণ ও জুলুম চিরস্থায়ী শাশ্বত আর চিরন্তন—এটা ভগবানের ইচ্ছায় বা পূর্বজন্মের পাপের জন্য হচ্ছে, এই যে কায়েমী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি, আমরা কি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সমস্ত প্রশ্নকে বিচার করব? অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে থাকবই—এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলে শেষপর্যন্ত কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে। তাই ঠিক করলুম, খোলামন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু বিচার করতে হবে। সমস্ত ঘটনার ভিতর থেকে খুঁজে বার করতে হবে কার্য ও কারণ এবং পরস্পর সম্পর্ক। প্রতিটি জিজ্ঞাসার যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক উত্তর পেতেই হবে, এই ছিল মনোভাব।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটাও বুঝেছিলাম যে, অনেক বন্ধু জীবনে বিস্তর বইপত্র পড়াশুনা করেন বটে, কিন্তু যাকে অধ্যয়ন করা বলে তা করেন না। অর্থাৎ, কোনো বিষয়ের মূলে তাঁরা প্রবেশ করেন না। মৌলিক পড়াশুনা না থাকার জন্য পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের ক্রমবিকাশ, ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না, আত্মবিশ্বাসও জন্মে না। আমরা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মূল বিষয়ের পড়াশুনা না করে ভাসাভাসা-

ভাবে অনেক কিছু পড়ার পরও মূলতঃ অজ্ঞই থেকে যেতে হয় এবং জীবনে প্রতিপদে হোঁচট খেতে হয়। অবৈজ্ঞানিক কায়দায় তাই যথেষ্ট পড়াশুনা করেও কোনও লাভ হয় না।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, আমাদের বইপত্র খুবই কম ছিল। আজ তো দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ও চাঁদে যাওয়ার যুগ! সেই তিরিশের দশকের অন্ধকার যুগে গোটা ভারতবর্ষে মার্কসবাদী বই বে-আইনীভাবে ২।১ খানাই মাত্র আসত। এই সমস্ত বই গোপনে সুদূর আন্দামানে জেলে নিয়ে পড়াশুনা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তবু আমরা কিছু কিছু বই গোপনে সংগ্রহ করে পড়েছিলুম। আমরা কিভাবে পড়েছি তারই ছোট একটি ছবি অতি সংক্ষেপে এবার তুলে ধরছি। এই পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে দিয়েই পরিচয় পাওয়া যাবে আমাদের দিবারাত্রি ব্যাপ্ত জীবনের তরঙ্গিত ধ্যান-ধারণাগুলির কথা।

প্রথমদিকে মার্কসীয় অর্থনীতি বুঝতে খুবই কষ্ট হয়েছে কিন্তু পরে দেখেছি, বুর্জোয়া অর্থনীতিই অনেক বেশি জটিল করে ও গোজামিল দিয়ে লেখা। ঐসব বইতে বুর্জোয়া শোষণ ব্যবস্থা কল্যাণকর ও চিরস্থায়ী—একথা বুঝাবার জন্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কাজে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। একটু তুলনা করে পড়লেই দেখা যায় মার্কসীয় অর্থনীতি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত করেই বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানেই মার্কসের অবদান অপরিসীম।

অর্থনীতি পাঠের মধ্য দিয়ে দেখলুম, অর্থনীতির সঙ্গেই যুক্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতি, উত্থান-পতন এবং তার ক্রমবিকাশ। নতুন উৎপাদনী শক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে, সমাজে দ্বন্দ্ব আসছে, সংঘাত বাড়ছে, আবার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন পরিবর্তিত সমাজ জন্ম নিচ্ছে। দেখলুম, ধনতান্ত্রিক সমাজে

উৎপাদনী শক্তির সীমাহীন অগ্রগতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার কল্পনাতীত শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু এই সীমাহীন অফুরন্ত শক্তি জনগণের কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এটা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ব্যবহৃত না হয়ে সমাজের সকলের জন্য ব্যবহৃত হলেই সকলে সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং সমাজ থেকে অনাহার, অশিক্ষা, বিনা-চিকিৎসা, বাসস্থানের অভাব সব শেষ করে দেওয়া যায়। এটা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই সম্ভবপর। এরই নাম সমাজতন্ত্র।

এখানেই বুর্জোয়া ও মজুরশ্রেণীর দ্বন্দ্ব: এর মধ্যেই নিহিত দুনিয়ার সংকট। এই বিরাট উৎপাদনী শক্তি জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে না, ব্যক্তিগত শোষণ ও মুনাফা লুটবার কাজে নিয়োজিত হবে? এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলেই আজ সমাজে বিপ্লব আসছে। একমাত্র বিপ্লব দ্বারাই পুরোনো সমাজকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভবপর। একমাত্র সমাজতন্ত্রই এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে।

অর্থনীতির পর দর্শন পড়া ঠিক করলুম। দর্শন হলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞান—মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর। মার্কসবাদী বিজ্ঞানের সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো দর্শন। এখানে এসে অনেকেই হোঁচট খায়, পিছিয়ে পড়ে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অজ্ঞতা ত্যাগ করতে পারে না বলেই অনেক সময় এমনটা ঘটে।

ভারতীয় ও অন্যান্য দর্শনের যত বই পেলুম সবই পড়ে ফেললুম। এই বিষয়টিই সবচেয়ে কঠিন মনে হলো। দেখলুম, যত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তির জাল বিস্তার করেই বলি না কেন—দর্শনকে কিন্তু আমরা মূলতঃ দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা: (ক) ভাববাদী দর্শন (খ) বস্তুবাদী দর্শন। ভাববাদীরা একমাত্র চিন্তাকেই প্রাধান্য দেয়—তাঁদের কথা হলো—কোনো অশরীরী শক্তি বা চিন্তাই সব কিছুর পরিবর্তনের মূল কারণ।

অপরদিকে বাস্তববাদীরা বলে—বস্তুই মুখ্য। পৃথিবীতে জীব-জন্তু না আসার পূর্বেও বস্তু ছিল এবং বস্তু থাকবে। বস্তুই মুখ্য আর প্রধান। মানুষের মস্তিষ্ক—বিশেষ উচ্চ ধরণের বস্তু, যার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। মস্তিষ্ক বস্তুকে পরিবর্তন করে ও তা মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার ক্ষমতাও রাখে। বাস্তব জীবনের উৎপাদনী শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভাববাদী দর্শনের মধ্যেও দুটি ভাগ আছে। এঁদের মধ্যে একদল হলেন অজ্ঞ, গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ভাববাদী। তারা মনে করেন যে, ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, মৃত্যু, চুরি, ধন-দৌলত, ব্যাভিচার—এমনকি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকার মৃত্যু থেকে শুরু করে যা কিছু পৃথিবীতে ঘটছে—সবকিছুই ভগবানের বা আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া পাপ, অলঙ্ঘনীয় নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে; এই অবস্থা থেকে নিস্তারের কোনো উপায় নেই। বাস্তব জীবনে কিন্তু এঁরা শিল্প-বিজ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জন্মনিয়ন্ত্রণ, এ্যাটম, রকেট, এরোপ্লেন, চাঁদে যাওয়া—মানুষের অকল্পনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে জীবনকে গোঁজামিল দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন।

অপর দলটি কিন্তু বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। তাঁরা বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান অনেক জেনেছে বা একদিন প্রায় সবকিছু জানতে পারে, এটা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের ভিতর কেউ বলেন, আমরা যা জেনেছি তাও ঠিক জেনেছি কিনা তা কে বলবে? (কাণ্ট)। এর মোক্ষম জবাব দিয়েছেন এঙ্গেলস। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, পরীক্ষা ও ব্যবহারের মধ্যেই সব জিনিসের পরিচয় নিহিত। পুডিং খাচ্ছ না জুতোর চামড়া খাচ্ছ তা খেলেই টের পাবে। এঁরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে সর্বশক্তিমান এক

শক্তির উপাসক। তাঁদের মাঝে একদল রয়েছেন যাঁরা সাহস করে একথা বলেন না—ভগবান বা সর্বশক্তিমান বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। এই দুনিয়ায় যা পাচ্ছ তাকে উপভোগ করো, যা পাওনি সর্বশক্তি দিয়ে শিল্প বিজ্ঞানের সাহায্যে তা পাবার চেষ্টা করো।

আমাদের মধ্যে একদম গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক তখন খুব কমই ছিল। তা সত্ত্বেও বলতেই হবে, আমরা সকলেই ছিলুম বিভিন্ন স্কুলের ভাববাদী দর্শনের উপাসক। জন্ম থেকে আমাদের পারি-পার্শ্বিকতায়, কাজ-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়—সর্বদিক থেকেই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য ছিল। আমরা ছিলুম ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সেই সমাজের সন্তান, যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও ধর্মীয় কুসংস্কার জট পাকিয়ে রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে বিপ্লববাদীরা গীতা, তুলসী ও কোরাণ হাতে নিয়ে ভগবান বা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করে বৈপ্লবিক জীবন শুরু করতেন। অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের সময় বরিশাল জেলে কোরাণ বুকে নিয়ে এক রাজবন্দীর মৃত্যু হয়েছিল।

কিন্তু তিরিশের দশকে এই অবস্থা অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। যারা জেলে ধর্মীয় কাজ করতে চায় তাদের সামান্যতম অসুবিধা হোক এ কেউ কোনো সময় চায় নি বা কেউ তাতে কখনো বাধারও সৃষ্টি করে নি। ধর্ম হলো মানুষের মন্ময় জগতের প্রশ্ন। কারো বিবেককে ধর্মমতকে তাই কখনো আঘাত করা হয় নি। এই আঘাত দ্বারা কোনো লাভও হয় না।

ধর্মের ব্যাপারে আমরা সেসময় কতটা সংস্কারমুক্ত ছিলুম তা একটা ঘটনা বললেই বোঝা যাবে। ১৯২৮ সালে বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের মৃত্যু-বর্ষিকী দিবসে বরিশাল শহরে শঙ্করমঠের ছাদের রাত দু'টোর সময় আমরা গোপনে বসে বালেশ্বরের সংগ্রামী দিবস পালন করছি। সেইদিনে একথা পুলিশ টের পেলে আমাদের রক্ষা ছিল

না। আমাদের সাথে ছিল একটি মুসলিম বন্ধু। হিন্দুমঠের ছাদের উপর বসে হিন্দু-মুসলিম একসাথে সভা করছি, এই সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ আমাদের মনে উদয়ই হয় নি। মুসলিমদের মধ্যে তখন বেশি ছেলে বিপ্লববাদী দলে আসে নি, তার বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলেও প্রধান কারণ হতো—তখনও মুসলিমদের মধ্যে বেকার সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। তা সত্ত্বেও আমরা কয়েকটি মুসলিম ছেলেকে দলে এনেছিলুম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার জন্য ১৯৩২ সালে একটি মুসলিম ছেলের উপরই দায়িত্ব পড়েছিল। শেষ-পর্যন্ত বিঘ্ন ঘটায় এই কাজটি হয় নি। আন্দামানেও আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মুসলিম বন্ধু ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে যে ধর্মীয় সংস্কার ও ভাববাদী দর্শনের প্রভাব ছিল, তা অস্বীকার করব না। এই সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের নিরন্তর চেষ্টা করতে হয়েছে।…

১৯৩৫ সালে আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনে সুদূরপ্রসারী কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। ইতিপূর্বে বেশ কিছু বন্ধু কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিল। আমরা কয়েকজন বন্ধু ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে এই সিদ্ধান্তে এসে গেলুম যে, ভারতীয় উপমহাদেশকে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করতে হলে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আমরা আরও বুঝলুম, গণবিপ্লবে পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের যেমন কোনো স্থান নেই। জনগণের কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই যদি আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ হয়, মজুরশ্রেণী ও মেহনতী জনতার নতুন সমাজ গঠন যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসেবে আমাদের কমিউনিস্ট হতেই হবে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত পার্টিই ভারতীয় জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে,

দেশকে স্বাধীন করে একটি সোশ্যালিস্ট সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। আর একমাত্র এই মতাদর্শই জনগণের বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র মানব-সমাজ থেকে দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা অনাহার, যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে পারে।

যে সমস্ত বন্ধুরা ইতিপূর্বেই নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিল সেই সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে নতুন বন্ধুদের সিদ্ধান্তের কথা নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের মতো আরও কিছু বন্ধু কমবেশি এই সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। পুরনো বন্ধুদের ও আমাদের সকলের চিন্তা হলো—সুদূর আন্দামানে বসে আমরা কি করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য ও শক্তিশালী করতে পারি। অথচ আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, আমরা অতীতে কেউ কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টি করি নি। আর, আমাদের মধ্যে তখন একজনও পুরাতন কমিউনিস্ট কর্মী ছিল না। সেই সময় প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশপ্রেমিক চেতনা এবং মানবিক ও মার্কসবাদী তত্ত্বগত চেতনাই আমাদের অনেককে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ে মার্কসবাদের ভিত্তিতে পেশাদার বিপ্লবীর মতো মজুর-কৃষক জনতার মধ্যে কাজ করতে আমরা কেউই তখন পরীক্ষিত সৈনিক নই।

ঠিক এই সময়, ১৯৩৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে আর এক চালান রাজনৈতিক বন্দী সেলুলার জেলে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবকুমার দাস ও চিত্ত বিশ্বাস। এঁরা বহন করে নিয়ে এলেন আলীপুর প্রেসিডেন্সি জেলের দুই কমিউনিস্ট বন্দী—কমরেড আবদুল হালিম ও কমরেড সরোজ মুখার্জীর একখানা চিঠি এবং সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটি ডকুমেণ্ট—'ড্রাফট

প্ল্যাটফর্ম অফ এ্যাকশন' এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনামূলক একটি প্রতিবেদন।

কমরেড হালিম ও কমরেড সরোজ মুখার্জী সেলুলার জেলে বন্দী সকল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কমরেডদের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা শাখার নামে আবেদন জানিয়ে বললেন যে, তাঁরা যেন জেলের অভ্যন্তরে সবাই একটি কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে সংঘবদ্ধ হয়ে বহির্জগতের সঙ্গে সথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করে সম্মিলিত পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে সুশিক্ষিত করে তোলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে নিজেদের প্রভাবকে ব্যাপক করে তোলেন।

এঁদের চিঠিতে আর একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল। সেটি হলো: আমরা ভিন্ন মতের বন্দীরা যেন জেলের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষের আক্রমণ ও আঘাতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলি।

বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুদূর আন্দামানের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বন্দীদের যোগাযোগ প্রচেষ্টা এবার সার্থক হলো। আমরা চিঠি পেয়ে আনন্দে ও উৎসাহে লাফালাফি শুরু করে দিলুম। জীবনে এই সর্বপ্রথম আসল বৈপ্লবিক কাজ পাওয়া গেছে—কমিউনিস্ট পার্টির কাজ। তুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সোশ্যালিস্ট ও প্রগতিশীল মুক্তি-আন্দোলন দেশে দেশে চলছে আজ থেকে আমরাও হলুম তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর থেকে মহান গৌরব বিপ্লবী জীবনে ও মুক্তি-আন্দোলনে আর কী হতে পারে? আজকের তুনিয়ায় মুক্তি-আন্দোলনের বিরাট জয় ও অগ্রগতির মাঝে দাঁড়িয়ে নতুন দিনের নবীন বন্ধুরা হয়তো আমাদের সেই দিনের আবেগের মূল্য সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না।...

এইভাবে আলাপ-আলোচনা, নানা শলা-পরামর্শের পর ঠিক করা হলো—আমরা যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, অর্থাৎ কমিউনিস্ট

মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছি এবং যারা ভবিষ্যতে মুক্তি পাবার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তারা একটি সংগঠনে সংগঠিত হব। এই সংগঠনের নাম হবে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন। আমরা সর্বক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ এবং কারাগারে কনসলিডেশনের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করব বলেও সিদ্ধান্ত নিলুম।

১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামান সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন সংগঠিত করা ঠিক হলো এবং ১ মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হলো। ৩৫ জন বন্ধু সেইদিন সর্বপ্রথমে কমিউনিস্ট বলে এই সংগঠনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন সংগঠিত হবার মাত্র ৫ দিন পরে কনসলিডেশন-এর উদ্যোগে সেলুলার জেলে মে দিবস পালিত হলো। সেদিন জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে খুব সকালে কনসলিডেশনের সদস্যবৃন্দ ছ-নম্বর ইয়ার্ডের তেতলায় একটি বড় সেলে একত্রিত হয়ে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও শপথ পাঠের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক মহান দিবসটি পালন করে।

এরপর নতুন বন্ধুরা কনসলিডেশনে এসে যোগ দিয়েছেন, সংগঠনের সভ্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। শেষের দিকে আন্দামানে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী কনসলিডেশনের সঙ্গে কমবেশী যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন।…

সেলুলার জেলে ৩৭ দিনের অনশন ধর্মঘট

আন্দামান রাজবন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাঙলাদেশের মানুষ, তারপরের স্থান ছিল পাঞ্জাবের। এই উভয় স্থানে মন্ত্রিত্ব

পেয়েছে—সুবিধাবাদী ব্রিটিশ খয়ের-খাঁ গোষ্ঠী। সুতরাং সংগ্রাম ব্যতীত মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি দেশেও ফিরে যেতে পারব না, একথা আমরা পরিষ্কার বুঝে ফেললুম। বেশ কিছু আলোচনার পর আমরা সকলে মিলে ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট স্মারকলিপি পাঠালুম : দেশে নতুন শাসনসংস্কার এসেছে সুতরাং সকলপ্রকার রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক এবং কাল-বিলম্ব না করে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা হোক। বন্দীদের ওজন, স্বাস্থ্যের রিপোর্ট, মেডিকেল চার্ট প্রভৃতি উপস্থিত করে দেখানো হলো—আন্দামানে বন্দীদের স্বাস্থ্য টিকছে না। আমরা প্রতিটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের নিকটও স্মারক-লিপি পাঠালুম।

কয়েকদিন পরই কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই জন সদস্য রায়জাদা হংসরাজ (কংগ্রেস, পাঞ্জাব) ও ইয়ামিন খাঁ (মুসলীম লীগ, দিল্লী) আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমরা বিস্তারিতভাবে নানা তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম যে, আন্দামানে আমাদের স্বাস্থ্য টিকছে না। আমরা একটি লিখিত মেমোরেণ্ডামও তাঁদের হাতে দিলুম। আমাদের দাবি হলো : অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাঁরা যাবার পূর্বে বললেন, "...আমরা ভারত গভর্নমেণ্টকে বলব, যতটা চাপ আইনসভায় সৃষ্টি করা যায় করব, তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলতে পারি না।" রায়জাদা হংসরাজ পাঞ্জাব বন্ধুদের, বিশেষ করে ধন্বন্তরী ও বিজয় সিং-এর পরিচিত ছিলেন। কারণ এদের মামলায় তিনি আসামীপক্ষের এডভোকেট ছিলেন। আমাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী রায়জাদা হংসরাজকে গোপনে বলে দেওয়া হলো : "যদি আগামী দুই মাসের মধ্যে আমাদের দেশে ফিরিয়ে না নিয়ে যেতে পারেন, তবে মনে রাখবেন আমাদের মৃতদেহগুলো বঙ্গোপসাগরে ভাসবে।"

দেশে নতুন শাসনসংস্কার এসেছে এই অবস্থা বিবেচনা করে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবিগুলো মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করলুম ঃ

(১) অবিলম্বে সকল রাজবন্দী (বিনাবিচারে বন্দী), রাজনৈতিক বন্দী (সাজাপ্রাপ্ত বন্দী অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। নির্বাসিত বন্দীদের দেশে ফিরে আসতে দিতে হবে। সমস্ত রকম গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, মামলা সব তুলে নিতে হবে। দেশে পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

(২) আন্দামান-রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৩) সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে তাদের সকলকে ডিভিশন 'টু'-র মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

অনশনে ১৫ দিন পূর্বে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে চরমপত্র পাঠালুম ঃ অবিলম্বে আমাদের দাবিপূর্ণ না হলে আমরা অনশন করতে বাধ্য হব। এই অনশনে যদি কোনো রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যু হয় তবে সেজন্য গভর্নমেণ্টই দায়ী থাকবে।

অনশনের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে আমরা চীফ কমিশনারকে চরমপত্র দিলুম। চীফ কমিশনার পরেরদিন সকালে এসে আমাদের ভয় দেখালেন ঃ "জানো, তোমরা জেল বিদ্রোহ শুরু করেছ, চরম সাজা তোমরা পাবে। বেত্রাঘাত, কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি, হাতকড়া, ২৪ ঘণ্টা সেলে লক-আপ—জেল-কোডের সমস্ত কঠোর সাজা তোমাদের উপর প্রয়োগ করা হবে।"

আমরা বললুম : "তুমি তো জানই আমাদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। এই অনশন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নয়—ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে। তোমার কর্তব্য হচ্ছে ভারত ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারকে অবিলম্বে অনশনের খবর জানানো। মৃত্যুসহ সকল রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই আমরা অনশন শুরু করেছি।"

আমরা গান্ধীজীকে টেলিগ্রাফে জানালুম : "আমাদের দাবি পূর্ণ হবে—দেশবাসী ও তোমাদের উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে অনশন তুলে নিলুম। তুমি ক্যাম্পে ও জেলের বন্ধুদের জানিয়ে দাও। আমরা আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, আমরা গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করত তারাও সেইপথ ত্যাগ করেছে।"

কলকাতায় এসেম্বলী হাউসের ঠিকানায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর নিকট টেলিগ্রাফ পাঠানো হলো : "আমাদের দাবী পূর্ণ হবে দেশবাসী ও আপনাদের উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমরণ অনশন তুলে নিলাম। আপনারা অনুগ্রহ করে ক্যাম্প ও জেলের বন্ধুদের অনশন ভঙ্গ করতে আমাদের অনুরোধ জানাবেন।"

দীর্ঘ ৩৭ দিনের দিন আন্দামান-রাজবন্দীদের আমরণ অনশন শেষ হলো। অনশন ভঙ্গের এক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাব, বিহার, ইউ. পি., মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের এবং বাংলার প্রায় ৫০ জন রাজনৈতিক বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

নলিনী দাস লিখিত
'দ্বীপান্তরের বন্দী' গ্রন্থ থেকে

(১) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে গৌরবজনক ও সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। এই ঘটনা দেশপ্রেম ও দুঃসাহসিকতার অদ্বিতীয় হলেও এটা ছিল মজুর-কৃষক-মেহনতী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস। কিন্তু এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিপ্লবী আবেগ ও দেশপ্রেমে তুলনাহীন, ত্যাগে সীমাহীন ও সাহসে কল্পনাতীত এইসব বীর যোদ্ধারা হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে দিয়েছিলেন।

(২) ১৯৩১ সালে হিজলী ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পলায়ন করেন দীনেশ মজুমদার, শচীন করগুপ্ত, সুশীল দাশগুপ্ত। ১৯৩৩ সালে বক্সা ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন জিতেন গুপ্ত, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। ১৯৩৩ সালে বহরামপুর ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন ধীরেন দাস ও নিরঞ্জন মুখার্জী। আর ১৯৩৪ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পলায়ন করেন পূর্ণানন্দ দাস, নিরঞ্জন ঘোষাল, সতীনাথ দে ও হরিপদ দে।

সরকার এই সমস্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য মোটা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

(৩) ত্রিশ দশকের বিপ্লববাদী রাজবন্দীরাই আন্দামানে সর্বশেষ কিছুটা সংগঠিত রাজনৈতিক বন্দী। আন্দামান ও ভারতব্যাপী

রাজবন্দীদের ঐতিহাসিক আমরণ অনশত ধর্মঘট এবং দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি এই রাজবন্দীদের সর্বশেষ ব্যাচকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করে।

(৪) বেলা তিনটের সময় আমার ডাণ্ডাবেড়ি খুলে দেওয়া হলো। ৪টার সময় সিপাহী এসে আমাকে গেটে নিয়ে গেল। দেখি, দাদা আর ছোট ভাই-এর সাথে মোলাকাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ আগেই টেলিগ্রাফ করে এদের আনিয়ে রেখেছিল। ছোট ভাই তো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। দাদা শান্তভাবে বললেন, 'আমাদের গণকঠাকুর বলেছিল, তোমার সমুদ্রযাত্রা আছে।' আমি বললাম, 'সমুদ্রযাত্রাই তো হচ্ছে।' দাদা বললেন, 'ফাঁসী যে হলো না এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। বেঁচে থাকলে আমরা আবার তোমায় দেখতে পাব।'

এদের আর কি সান্ত্বনা দেব! শুধু বললাম, 'দেশের মুক্তির জন্য এমনি কত শত শত ছেলেমেয়েকেই তো জীবন দিতে হচ্ছে। আরও দিতে হবে। তোমাদের একটি ভাইকে নাহয় দিলে।' চোখের জলের ভিতর দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

(৫) অবশেষে আজীবন সাজা নিয়ে আন্দামানের পথে যাত্রা শুরু হলো। গেটে নিয়ে আবার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি, হাতে হাতকড়া, মাজায় দড়ি লাগানো হলো। আলীপুর জেলে থাকতেই শুনেছিলাম এবার কোনো বন্দীকেই আন্দামানে পাঠানো হবে না। তাই জেলারকে জিজ্ঞাসা করলুম 'আর কেউ যাবে না?' জেলার উত্তর দিল: 'না। এবার একমাত্র তুমিই যাচ্ছ।'

বন্দী গাড়িতে গুর্খা সৈন্য, সাহেবের সার্জেন্ট মিলে ৯।১০ জন। আমাদের গাড়ির সম্মুখে ও পিছনে তিনজন করে সার্জেন্ট। বড় বড় অফিসারদের কয়েকটি গাড়ি এবং সাদা পোষাকে অসংখ্য গোয়েন্দা

পুলিশ। বন্দীদের কাছে শুনেছি, বন্দীদের প্রথম ব্যাচগুলো যখন আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তখন রাস্তায় যানবাহন, ট্রাম-বাস, সাধারণ লোকের চলাফেরা—সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

জাহাজ ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে কলকাতার বিশেষ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জাহাজে উঠে এলো এবং আমার সাথে আলাপ করতে বললো, 'এই তোমার শেষ যাত্রা আর তুমি ভারতে ফিরে আসতে পারবে না।' আমি বললুম, 'সাহেব, আমরা ফিরে আসবই, কিন্তু স্বাধীন ভারতে তোমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তোমরা কিরকম নির্দয় জানো'? আমরা একই মামলার আসামী। দিনের পর দিন একসাথে কাটিয়েছি। সেই দীনেশ মজুমদারের সাথে আমাকে শেষ দেখা করতে দেওয়া হলো না।'

সাহেব হাসতে হাসতে বললো, 'এর জন্য তুমি অত চিন্তা করছো কেন? আজ রাত্রেই তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে।'

ক্রোধ, ঘৃণা ও অব্যক্ত বেদনায় মন ভারাক্রান্ত ও বিষিয়ে উঠল। একটি কথাও বলা আর সম্ভব ছিল না। মুখটা ফিরিয়ে নিলুম।

(৬) কালাপানি অর্থে জলরাশি পার হয়ে আন্দামান দ্বীপ। এর সর্বত্র নিস্তব্ধ প্রাণহীন পাথর আর চারদিকে অথৈ সমুদ্র। তার মাঝে পাহাড়. তার মাঝে জেল। বন্দীদের নিয়ে প্রথম ঢোকানো হয়েছিল পোর্টব্লেয়ার সেলুলার জেলে। ৭০০ সেল বা ছোট কোঠা দিয়ে তৈরি এই সেলুলার জেল।

প্রথমে একসাথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বন্দীদের নাম ডাকা হত। এক ইংরেজ অফিসার ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে সামনে এসে জিজ্ঞাসা করতো: Do you know English? তোমরা কি ইংরেজী জান? হয়তো উত্তর হতো: Yes—হ্যাঁ। এরপরই শাসক সাহেব বলে উঠতেন: Remember, it is not Bengal. It is Andamans. Lions are tamed here. অর্থাৎ মনে রেখো

এটা বাঙলাদেশ নয়, এটা আন্দামান, এখানে সিংহকে পোষ মানানো হয়।

পরবর্তী হুকুম হোত: 'সেলে নিয়ে যাও'। তারপর কামার-শালায় নিয়ে গিয়ে ডাণ্ডাবেড়ি কাটা হোত। বন্দীদের আগমনে রাস্তায় বা জেলখানায় সর্বত্র কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হোত। রাস্তার কোনও লোক চলতো না। সে এক গভীর নীরবতা। সর্বত্র জুড়ে থাকত এক ভয়ঙ্কর থমথমে ভাব।

(৭) যাহোক, ১৯৩৬ সালে পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং চীনদেশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নয়া-গণতন্ত্রের সংগ্রাম। আমরা এই সমস্ত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যতটুকু সংবাদ সুদূর আন্দামানে বসে সংগ্রহ করতে পারতুম তা নিয়েই তর্ক-বিতর্ক ও আনন্দ অনুভব করতুম। আমরা জানতুম স্পেনের গণতান্ত্রিক শক্তির জয় মানে দুনিয়াব্যাপী গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাকামী মানুষেরি জয়। তাই যেদিন শুনলুম, স্পেনে গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা শাক্‌লাৎ-ওয়ালার নামে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠিত হয়েছে, সেদিন আমাদের আনন্দ আর ধরে না। র‍্যালফ ফক্স, কডওয়েল, হেমিংওয়ে ও অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক ও বিপ্লবীরা ফ্যাসিস্ট দস্যুদের হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য জীবন আহুতি দিতে সমর ক্ষেত্রে রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছেন, একথা জানার পর সেদিন সুদূর আন্দামানে বসেও সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করলুম দুনিয়াব্যাপী সভ্যতার লড়াইতে আমরাও এঁদের সঙ্গে রয়েছি। ভারতীয় জনতার পক্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহানুভূতি ও সমর্থন জানাবার জন্য যুদ্ধফ্রণ্টে গিয়েছিলেন এবং স্পেনের সংগ্রামী জনতাকে সাহায্য করার জন্য অর্থের আবেদন করেছিলেন। আমরাও এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সৌভ্রাত্রমূলক সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন উপবাস

করেছিলুম এবং সামান্য কিছু টাকা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। আজকে বিরাট পরিবর্তিত সোশ্যালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা ও প্রগতিশীল মানবসমাজ অসীম শক্তির অধিকারী সত্ত্বেও যেমন আমরা ভিয়েতনামে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর পরাজয়ে উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হই, এবং মুক্তি ফৌজের সাময়িক পরাজয়ে, মর্মাহত ও নিরুৎসাহ হই, সেইদিনও সেইরূপ হতুম। বার্সিলোনার পতনের সংবাদে আমাদের অনেক সেলেই সেদিন আলো জ্বলে নি। আমরা রাত্রে উপবাস করে কাটিয়েছি এবং পরের দিন কমরেড স্তালিনকে টেলিগ্রাফ করেছিঃ 'অনুগ্রহ করে স্পেনে হস্তক্ষেপ করুন।'

যাহোক, কিচেন ভাগ করে কমিউনিস্ট না হবার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এই কিচেন ভাগের পূর্ণ সুযোগ নিতে থাকে জেল কর্তৃপক্ষ আর বন্দীদের মাঝেও কাজের চাপ এবং হয়রানি নতুন করে বাড়তে থাকে। বন্দীদের নিকট সে এক অসহ্য দমবন্ধ অবস্থা। কমরেড হালিম আলীপুর জেলে এই কথা শুনে খুবই দুঃখ পান। তিনি আলীপুর জেল থেকে আন্দামান-বন্ধুদের নিকট গোপনে চিঠি পাঠিয়ে বলেনঃ '—আপনারা শুধু এইটুকু বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনাদের ঝগড়াঝাটি, দলাদলির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে জেল-কর্তৃপক্ষ। আপনারা কার দোষ বেশি বিচার না করে অবিলম্বে একত্রিত হয়ে যান। দেশ আপনাদের নিকট অনেক বেশি আশা করে।' (প্রেসিডেন্সি জেল থেকে সরোজ মুখার্জীও এই জাতীয় চিঠি লিখে পাঠান।) এই ক্ষুদ্র ও গোপন চিঠিখানা ম্যাজিকের মতো কাজ করল। চিঠিখানা পাবার পরই আড়াইশত রাজবন্দী এক রাত্রের মধ্যেই গোপনে আলোচনা করে সবগুলো কিচেনের খাবার ব্যবস্থা একত্রিত করে ফেললো। পরের দিন জেল-কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা দেখে

হতভম্ব ও একদম বোকা হয়ে গেল। রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে এলো আনন্দের নতুন জোয়ার। এই চিঠিখানা যে বন্ধুটি আন্দামানে নিয়ে গিয়েছিলেন (দীনেশ দাস—দীনাজপুর) বন্দীদের মাঝে তাঁর নাম হয়ে গেল শান্তির দূত—উইলসন।

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সর্দার গুরুমুখ সিং আন্দামানে পুনরায় ফিরে আসেন। এই সর্বপ্রথম আমরা একজন পুরো কমিউনিস্টকে আমাদের মাঝে পেলুম। সর্দারজী পূর্বে আমাদেরই মতো একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ছিলেন বলে অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আকাক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁকে আমাদের মাঝে পেয়ে সকলের যে কী আনন্দ হলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর আগমনে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো।

আমাদের নিজেদের ভিতর সেসময় যেসব মতদ্বৈধতা বিরাজ করছিল আমরা তাঁর নিকট তা সবই উপস্থিত করলুম। তখন মতদ্বৈধতার জন্য কনসলিডেশন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে রয়েছে। আমরা কনসলিডেশন থেকে তাঁকে উপদেষ্টা নিযুক্ত করলুম।

প্রথমেই কনসলিডেশনের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানালুম। তিনি উত্তরে বললেন: 'তোমরা এতগুলো বিপ্লববাদী লোক কমিউনিস্ট হয়েছে, এটা খুবই আনন্দের কথা।' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তিনি আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলী

সৈয়দ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
আসিয়ার সৈয়দ মঞ্জিল
ব্রাউন কম্পাউণ্ড, বরিশাল
তাং ১, ৭. ৮২ (ইং)

শ্রদ্ধেয় সর্ব্বাদা,

প্রণাম জানবেন। ইলার কাছে লিখিত আপনার ১৯. ৬. ৮২ (ইং) তারিখের চিঠি দেখলাম। তাতেই জানলাম আমার দেয়া চিঠি আপনার হাতে পৌঁছেছে। কিন্তু উত্তর দেন নি তাও জানলাম। আমার চিঠিটা কি প্রয়াত শিক্ষাগুরু কমরেড নলিনী দাশের হাতে পড়েছিল? যখন চিঠিটা গিয়েছিল তখন কি উনি তুলনামূলক সুস্থ ছিলেন? উনি কি আমার চিঠিখানা নিজে পাঠ করতে পেরেছিলেন? অথবা কেউ পাঠ করে শুনিয়েছিল? যদি শুনে থাকেন তবে তার উত্তরে কোন মন্তব্য করেছিলেন কি-না। এসব জানতে দারুণ ইচ্ছা হচ্ছে। আজ দাদা নেই শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে উনি সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মাঝখানে ফিরে আসবেন।

সর্ব্বাদা, দাদার মৃত্যুর পূর্বেকার নানান অবস্থা এবং কি করুণ-ভাবে এই বিপ্লবীর মৃত্যু হল, কোন্ শ্মশানে শেষ কৃত্যানুষ্ঠান করলেন এসব বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি লিখবেন আশা করি। এসব ঘটনা না জানতে পারলে ততক্ষণ মনস্থির করতে পারব না। আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার শূন্যস্থান কোনদিনও পুরণ হবার নয় কারন নলিনী দাশ রোজ জন্মায় না। ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর স্থানে স্থানে এদের

আবির্ভাব হয়। ১৯৭২ সাল থেকে তার হাতে মানুষ হয়েছি। দীর্ঘ এক যুগ প্রায়। সুতরাং চলতে, ফিরতে, কাজের ক্ষেত্রে, চিন্তায় সর্বত্রই তাঁর ছাপ রয়ে গেছে। দোয়া করবেন যেন তাঁর যোগ্য শিষ্য হতে পারি। আমরাই নয় শুধু, ঘোর রাজনীতি বিরোধী যারা ছিল তারাও যেন নলিনী দাশের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না। সেদিন ১৯. ১২. ৮২ তাং রাত ৮-২১ মিঃ ভারতের কলকাতার বেতারের ঘোষণার পরে সারা সহরে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। কারো মুখে যেন হাসি নেই, কথা নেই, চোখে জল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। অগণিত লোক আসছে দাদার খোঁজ নিতে, কি হল তাঁর? কেমনে মারা গেল সেসব জানতে। যদিও বেতারে শুনেছে তাঁর মৃত্যুর কারণ তবুও নলিনী পাগলেরা ছুটে আসছে বিভিন্ন কথা বলতে। যখন দাদা মারা গেলেন তখনই মুকুলদা ছিলেন অপারেশন থিয়েটারে। সেদিন দুপুরে তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল না। মুকুলদা ১০ দিন হাসপাতালে থাকার পরে ঘরে ফিরেছেন। মাসীমা বাচ্চাদের মত কাঁদে। মুকুলদা ভেঙ্গে পড়েছেন।

সর্ব্বদা, নলিনীদার শবযাত্রা এবং অন্যান্য খবর দিয়ে নিশ্চয়ই পত্রিকাগুলো সংবাদ ছেপেছে। আপনার দোহাই ভগবানের, সেসব পত্রিকার ২।৩ কপি সত্বর আমাদের কাছে পাঠাবেন আশা করি। এবার যেন চিঠির উত্তর পাই। আপনাদের পরিবারের ২।১ জন ছাড়া অন্য সবাইর সাথে (যারা এখানে আছে) আমার পরিচয়ই শুধু নয় ঘনিষ্ঠতা আছে। মন্টুদা, আশিষদা বর্তমানে বরিশালে শিক্ষকতা নিয়েছের, অজয়দা আছেন ঢাকাতে, বেবী, ছবি ওরাও ঢাকা।

আমার পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছি ঃ—আমি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি, বরিশাল জিলা সংসদের দ্বিতীয়বারের মতন সভাপতি। নলিনী দাশের হাতে গড়া ছাত্রকর্মী। C.P.B.-এর কর্মী।

রণেশদা ও জ্যোতিদাকে প্রণাম জানাবেন প্রণাম আপনাকেও পুনরায়। ইতি—

বরিশাল
১.৭.৮২ ইং জাহাঙ্গীর
রাত ১টা

শ্রীমান জাহাঙ্গীর ১৯৮২-তে B. Sc. পাস করেছে।

রোগের সংবাদে উদ্বেগ জানিয়ে চিঠি

মণি সিংহ
২৭১।৪ মালীবাগ, ঢাকা-১৭
বাংলাদেশ—১৫।৫।৮২

প্রিয় খুসু,

ভিসা বাড়ান নিশ্চয়ই দরকার। সেটা করা হইতেছে এটা খুব ভাল হইয়াছে।

কমঃ বঙ্গেশ্বর ও গনেশদা সরকারী সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন এটা উত্তম হইয়াছে। ব্যবস্থা কি হইল না হইল আমাকে জানাইবে। নলিনীদার অবস্থার উন্নতি হইতেছে কি-না জানাইও।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় রহিলাম।

মণি সিংহ

মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক বার্তা

নলিনীদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হল।'

মণি সিংহ
(সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি)
মোহাম্মদ ফরহাদ (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি)

সৈয়দ মোহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
আসিয়ার সৈয়দ মাঞ্জুল
ব্রাউন কম্পাউণ্ড
বরিশাল

পরিচয় ঃ—বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি, নলিনী দাসের হাতে গড়া ছাত্রকর্মী। সি. পি. বি.-র কর্মী।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
স্মৃতি পাঠাগার
বরিশাল
তারিখ ঃ ১৪. ৫. ১৯৮২

নলিনীদা,

শুভেচ্ছা জানবেন। বেশ দিন হয়ে গেল আপনি আমাদের থেকে অনেক দূরে। প্রতিমুহূর্ত আপনার অনুপস্থিতি তীব্রভাবে আমাদের নাড়া দেয়। শুনলাম আপনি হসপিটালে চিকিৎসাধীন। শীঘ্র সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে আসুন এ কামনা করি নিয়তই।

গিয়েছিলাম গতরাতে মাসীমার কাছে। আপনার কথা বললাম। তিনিও আপনার শূণ্যতা উপলব্ধি করেন। মাসিমাও কামনা করলেন, আপনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে আসেন। সত্বর সুস্থ হউন কামনান্তে

ইতি
আপনার স্নেহের
জাহাঙ্গীর
বরিশাল

‘দৈনিক বসুমতী’ হইতে গৃহীত

২০ জুন, ৮২ :

বালাংদেশের কমিউনিস্ট নেতার জীবনাবসান

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলদেশের বরিশালের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা শনিবার বেলা ১২-৪০ মিনিটে কলকাতায় মারা যান। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য গত মার্চ মাসে ভারতে আসেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা নলিনী দাসের জীবনাবসান

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৯ জুন—প্রাক্তন বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রাক্তন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী বরিশালের নলিনী দাস দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১৯ জুন বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে কলকাতার টিউবারক্যুলার রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২। তিনি ছিলেন অকৃতদার। বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট কমিউনিস্ট সংগঠক চিকিৎসার জন্য গত মার্চ মাসে কলকাতায় আসেন।

রক্তপতাকা সজ্জিত প্রয়াত নেতার মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বহু প্রবীণ নেতা হাসপাতালে উপস্থিত হন এবং যাঁরা মাল্যদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঃ বঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে গুরুদাস দাশগুপ্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে বামফ্রন্ট মন্ত্রী রাধিকামোহন ব্যানার্জী, সি পি আই মন্ত্রী কানাই

ভৌমিক, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা আবছুর রেজ্জাক খান ও কালান্তরের পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত। আরও যাঁরা মাল্যদান করেন তাঁরা হলেন কালিঘাট-আলিপুর সি পি আই (এম) আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে স্বদেশ দাস এবং পার্কসার্কাস-এন্টালী সি পি আই আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে বেণু ধর।

প্রয়াত নেতার মরদেহ প্রাক্তন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী মৈত্রী চক্রের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে মাল্যদান করেন মৈত্রী চক্রের পক্ষে অমলেন্দু বাগচী।

প্রাক্তন সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁরা হলেন: মনোহর মুখার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, ইলা মিত্র, রবি গুহ, অসিত গুপ্ত, সুবোধ দাশগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, কুমার মিত্র, বরিশালের প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ ব্যানার্জী, নুটু ব্যানার্জী প্রমুখ।

আন্দামানের সহবন্দীদের মধ্যে ছিলেন খুশু দত্তরায়, সত্য চক্রবর্তী, বঙ্গেশ্বর রায়, কালিকিঙ্কর দে, বিরাজ দে, সমর ঘোষ, ভগবান বিশ্বাস, বঙ্কিম চক্রবর্তী প্রমুখ। কেওড়াতলা শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সময় স্থানীয় অনেক যুবছাত্র কর্মীরা উপস্থিত হন ও প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন।

কালান্তর ২০-৬-৮২

বাংলাদেশের আমরণ মুক্তিযোদ্ধা নলিনী দাস স্মরণে

অরিন্দম গুপ্ত

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে পূর্ববাংলা তার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের লক্ষ্যে নিয়োজিত কাজে একেবারে শুরুতেই যে পরীক্ষিত ও দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের

সম্পদ হিসেবে পেয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বরিশালের নলিনী দাস ছিলেন অন্যতম। গত মার্চ মাসে ৭২ বছর বয়সে দুরন্ত ক্ষয়রোগ বুকে নিয়ে তিনি ঢাকার চিকিৎসকদের পরামর্শে কলকাতায় এলেন রোগমুক্ত হয়ে যথাসত্বর বরিশালের কর্মস্থলে ফিরে যাবার বাসনা নিয়ে। তাঁর আর ফিরে যাওয়া হলো না। বলতে গেলে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন শেষ অবস্থায়। গত ১৯ জুন বিপ্লবী কবি সুকান্তের মতোই রক্ত উগ্‌রে কলকাতার এক যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হলো। হিজলী বন্দী নিবাসে নিহত বরিশালের শহীদ তারকেশ্বর সেনের মতোই নলিনী দাসের দেহ ছাই হলো কেওড়াতলার শ্মশানে।

কলকাতার সঙ্গে অবশ্য তাঁর প্রথম যৌবনেই আমাদের উপ-মহাদেশের পরাধীনতা মোচনের বিপ্লবী অভিযাত্রার যুগে অগ্নিসূত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ২৩ মে তৎকালীন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের একটি বাড়িতে নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় পুলিসের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে রিভলভারের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁরা ধরা পড়েছিলেন। দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী হয়েছিল। নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে আন্দামানে গিয়েছিলেন সেখানে ৪ বছর ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় জেলে ফিরবার পরে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে বরিশালে চলে গিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে সংগঠন গড়ার কাজ নিয়ে। সেখানেই ৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আরব্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের স্থানীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি। ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি রেখেছিলেন অবিস্মরণীয় অবদান। কলকাতায় এসেছিলেন ৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে। সঙ্গে ছিল তাঁর বই 'দ্বীপান্তরের বন্দী'র পাণ্ডুলিপি।

১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানী সামরিক শাসকচক্রের হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করার সময় বরিশালের গ্রামে গ্রামান্তরে কৃষক সংগঠনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি এই বই লিখেছিলেন। এই বই ৭২ সালে কলকাতার মনীষা ও ঢাকার প্রকাশভবন বের করেছে। এই বইটি আমাদের উপমহাদেশের অর্ধশতাব্দীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। কমিউনিস্ট আন্দোলন যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর থেকেই বিশ্বব্যাপী মেহনতি মানুষের এবং সমস্ত জাতির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেতনা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, নলিনী দাস সেকথা প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর এই বইটিতে জানিয়েছেন। ধর্ম-নিরপেক্ষতা যে উপমহাদেশের বিপ্লবের জন্যে উৎসর্গিত অসংখ্য বীরের ও মেহনতি জনগণের অভিযাত্রার অপরিহার্য পাথেয়, সেকথা নলিনী দাস তাঁর দ্বীপান্তরের বন্দীর কাহিনীতে উৎকীর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর এই নির্দেশ থাকছে সমস্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবীর জন্যে।

বাংলাদেশ থেকে একইসঙ্গে প্রকাশিত এই বইটি নলিনী দাসকে তাঁর রেখে যাওয়া কর্মক্ষেত্রে সবসময় স্মরণ করিয়ে দেবে।

বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির অফিসে গিয়ে তিনি আর বসবেন না। এই জেলার গ্রামে গ্রামাঞ্চলে তিনি আর উদ্ভূত সব সমস্যার সমাধানের জন্যে আহূত হলেও সাড়া দেবেন না। কিন্তু '৪৭ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত তিনি যা করেছেন তাকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই-এর অনুপ্রেরণা ও দিকদর্শনের উৎস হিসেবে সহকর্মীরা ও জনগণ ব্যবহার করবেন।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে হিজলী-বন্দী নিবাস থেকে পালাবার পরে নলিনী দাস বরিশালের গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতেন। মহাবিপ্লবী সূর্য সেনের মতোই অতি সাধারণ চেহারার নলিনী দাস গ্রামের মাটির মানুষদের মধ্যে মিশে থাকতেন।

তাঁকে পুলিস বেড়াজালের মধ্যে থেকেও দু-বছর ধরে চেষ্টা করেও ধরতে পারে নি। এই ধারাতেই তিনি ১৯৪৮ সালে হুলিয়া মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠনের কাজ করতেন। ৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আকস্মিকভাবে এক জায়গায় আটকে পড়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রধানত রাজশাহী জেলে বন্দী থাকার সময় ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক রাজবন্দীদের কাছে তিনি আদর্শ স্থানীয় হয়ে ওঠেন। জেলখানায় তিনি সঙ্গীদের নিয়ে 'বাইদা' সেজে রাজনৈতিক নাচ-গান করতেন। বস্তুতপক্ষে আচারে আচরণে বাংলাদেশের গণমানসের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন তিনি। ১৯৫৮ সালে তাঁকে আবার ধরার জন্যে পাকিস্তানী শাসকচক্র চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ১২ বছর তিনি বরিশালের গ্রামে গ্রামান্তরেই রইলেন। প্রয়োজন পড়লে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে খেতের কাজে নেমে যেতেন। নৌকার মাঝি হতেন। ৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসে পাকিস্তান সামরিক শাসকচক্রের হানাদাররা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে ধাওয়া করে বরিশালের বন্দরে বন্দরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, তখন নলিনী দাস নৌকা নিয়ে মাঝি হয়ে কাছাকাছি থেকেছেন মুক্তি-যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্যে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক আলোচনাতেও অবশ্য নলিনী দাসের যথেষ্ট দখল ছিল বলে বরিশাল শহরও তাঁকে সবসময় চেয়েছে। ১৯৩০'এর দশকের যৌবনের ক্ষিপ্রগতি বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলে নলিনী দাস শহরের মানুষের প্রয়োজনেও সবসময় সাড়া দিয়েছেন। বরিশালের মনোরমা মাসীমার কর্মকেন্দ্র মাতৃমন্দিরে নলিনী দাসের ডেরা ছিল। এই 'ডেরা' হবে তাঁর একটি স্মারক। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নলিনী দাস তাঁর 'ভোলার' পৈতৃক ভিটা ও বাড়ি একটি ট্রাস্টির হাতে তুলে দিয়েছিলেন সমাজ হিতৈষী কাজের জন্যে। সারা বাংলা-দেশকেই তিনি করেছিলেন ঘর।

বাংলাদেশ তার এই একান্ত উৎসর্গিত বিপ্লবী সন্তানকে স্মৃতির মণিকোঠায় কিভাবে কোথায় রাখে সেটাই দেখা যাক। নলিনী দাস বিপ্লবের কাজে ঘর ছেড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর স্নেহ-প্রীতি ভালবাসা ছড়িয়ে থাকতো বাংলাদেশের—গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামী মানুষের ঘরে ঘরে। তরুণ-তরুণীরা সবসময় স্মরণ করবে তাঁর সহজ সরল প্রাণবন্ত স্নেহময় উপস্থিতিকে। এবার শেষ যাত্রায় কলকাতায় এসে তিনি উঠেছিলেন প্রতাপাদিত্য রোডে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাসায়। '৭১ সালেও এখানেই উঠেছিলেন। তাঁদের মারফত কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গেরও ঘরে ঘরে তরুণতরুণীদের জন্যে তিনি রেখে গেলেন নিকট আত্মীয়ের শুভেচ্ছা।

'কালান্তর', ২১-৬-৮২

বিপ্লবী নলিনী দাস—দেশপ্রেম ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক

দেশ জুড়ে এক ঝড়ো হাওয়া ধেয়ে আসছে পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে। এই সময় বিপ্লবী নলিনী দাসের মতো কাণ্ডারীরা থাকলে ভাল হতো। তবে ভরসা এই যে, একজন নলিনী দাস গিয়েছেন, তাঁর জায়গায় আরো নলিনী দাস আসছে, আসবে।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রয়াত নলিনী দাসের স্মরণে আজ প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে আয়োজিত এক শোকসভায় উপরোক্ত মর্মে বক্তব্য বলেন সভার সভাপতি ও প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রেজ্জাক খান। ঐ সভায় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায় অতীত স্মৃতিচারণ করে বলেন, প্রয়াত শ্রীদাস প্রগতিশীল আন্দোলনের

গর্ব। শ্রীরায় বলেন, দেশ ও পার্টির জন্যে নলিনী দাসের ছিল অপরিসীম নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ ও একাগ্রতা।

'কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতি দাশগুপ্ত বলেন, নলিনী দাস একদিকে যেমন ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর, অপরদিকে তাঁর ব্যবহার ছিল স্নেহ মমতায় ভরা। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নলিনী দাস অসুস্থ অবস্থায় এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েও মনপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন নি তিনি অসুস্থ। রোগশয্যায় শুয়েও তিনি অসমাপ্ত বিপ্লবী ধারা সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে উন্মুখ ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বঙ্গেশ্বর রায় স্মৃতিচারণ করে বলেন, নলিনী দাস নিজেও ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। নলিনী দাস ছিলেন প্রচণ্ড আশাবাদী, তিনি জীবনকে কখনো পরোয়া করেন নি, মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছেন আজীবন। অথচ সেই নলিনী দাসই অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পান। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামীর মৃত্যু আমি দেখেছি নলিনীদার ঐ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। আজকে এই সভা সেদিক থেকে অসম্পূর্ণ। যা প্রয়োজন তা হল নলিনী দাসকে নিয়ে আলোচনাচক্র বলে বঙ্গেশ্বর রায় অভিমত প্রকাশ করেন।

রণেশ দাশগুপ্ত বলেন, নলিনী দাস 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' অসম্ভব বিরোধী ছিলেন। তাঁর লেখা 'দ্বীপান্তরের বন্দী' চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার তিনি আহ্বান জানান। এঁরা ছাড়া নলিনী দাসের বাল্য সহযোগী পঙ্কজ ব্যানার্জী, কমলা দাস প্রমুখও বক্তব্য বলেন।

সভা শুরু হয় স্মিতা গুহ এবং গৌতম দত্তের সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে। এরপর নয়নারঞ্জন দাশগুপ্ত নলিনী দাসের মৃত্যুতে মণি সিংহ, ফরহাদ সহ নানা জন ও পত্রপত্রিকার শোকবার্তা পাঠ করেন। আন্দামান মৈত্রী চক্রের পক্ষে মধু ব্যানার্জী, যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী, সমন্বয় আসর বিপ্লবী তীর্থের পক্ষ থেকে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

'কালান্তর' ১১-৭-৮৪

প্রয়াত কমরেড নলিনী দাসের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম

মোহাম্মদ ফরহাদ

কমরেড নলিনী দাস চির-বিদায় নিয়েছেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ তাঁর মহান স্মৃতি স্মরণ করছি।

গত ১৯ জুন দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতার কলকাতায় জীবনাবসান ঘটেছে। কমরেড নলিনী দাস ১৯১০ সালে বরিশাল জেলার ভোলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আজীবন এক সংগ্রামী যোদ্ধা। বাল্যকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। সহ্য করেছিলেন নির্যাতন-নিপীড়ন। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাভোগ করেন। ১৯২৯ সালে মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয় এবং '৩০ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৩১ সালে কারাগার থেকে পালিয়ে এসে কমরেড নলিনী দাস কলকাতা, বরিশাল, চন্দননগর এলাকায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন এবং একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং ৩৪ থেকে ৩৭ সাল পর্যন্ত আন্দামানে কারাগারে আটক ছিলেন। সংগ্রামের মধ্যেই আন্দামানের বন্দীজীবনে গ্রহণ করেছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট।

কমিউনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের মধ্যে বিশেষত কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মধ্যে বিপ্লবী প্রেরণা সৃষ্টির কাজে তাঁকে কেউ কখনো নিবৃত্ত করতে পারে নি। পাকিস্তান আমলের প্রায় সমগ্র সময়কালই তাঁকে কাটাতে হয়েছে হয় কারাগারে অথবা আত্ম-গোপন অবস্থায়। আত্মগোপন অবস্থায় থেকেও তিনি গ্রামের কৃষকদের মধ্যে পড়ে থেকে তাদের সংগঠিত করার কাজ করে গিয়েছিলেন। শহরের তরুণ-যুবকদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে গিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির বরিশাল জেলা সংগঠনের তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। সমগ্র দেশের সংগঠনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত নেতা।

অন্যান্য বহু সংগঠন এমনকি বিরুদ্ধবাদী সংগঠনের নেতা-কর্মী—যাঁরাই নলিনী দা'র সংস্পর্শে এসেছিলেন—তাঁরা তাঁকে কখনো ভুলতে পারতেন না। সকলের মাঝেই তাঁর ছিল মর্যাদার আসন।

তাঁর বিপ্লবী নিষ্ঠা তাঁর প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করত। তিনি ছিলেন ত্যাগী, সদালাপী এবং সহজ-সরল মাটির মানুষের মতো। সে সঙ্গে সংকল্পে ছিলেন ইস্পাত-দৃঢ়। সুখের জীবনকে তিনি সচেতন-ভাবেই পরিত্যাগ করেছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি যে ভূসম্পত্তি লাভ করেছিলেন—জনকল্যাণের জন্য ভোলাতে সে সম্পত্তিও তিনি দান করে গেছেন। গরিবের দেশ বাংলাদেশে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, খেয়ে না খেয়ে চলাফেরা করাটাকেই তিনি স্বাভাবিক মনে করেছেন।

তিনি সংসার-ধর্ম পালন করেন নি। চিরকুমার ছিলেন তিনি। গরিব, শোষিত-বঞ্চিত-দুঃখী মানুষের সুখের সংসার গড়ে তোলায় সংগ্রামেই তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত।

কমরেড নলিনী দাস 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' নামে স্মৃতিকথামূলক একটি বই লিখেছেন।

এই মহান মানুষটিকে আমরা হারালাম দেশের জন্য, বিশেষত এদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য ঘটে গেল এক অপূরণীয় ক্ষতি। এ ক্ষতি কেবল বরিশাল জেলার নয়, সারা দেশের জন্যই এক বিরাট ক্ষতি।

কমরেড নলিনী দাসের মত ত্যাগী নেতার প্রয়োজন ছিল আজ অনেক বেশি। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। একথা সত্য যে ব্যক্তি-মানুষের মৃত্যুকে বিজ্ঞান জয় করতে পারে নি। কিন্তু যে মানুষ সত্য, ন্যায় এবং মহান আদর্শের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেন, সে মানুষের মৃত্যু নাই। তাই আমাদের প্রিয় নলিনী দা চির-অমর হয়ে থাকবেন।

নলিনী দা তাঁর মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদাহরণ রেখে গেছেন তা আজ আমাদের চলার পথের ধ্রুবতারা হোক্। এদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি একদিন ফুটবে। নলিনী দা'কে তার মাঝেই আমরা ফিরে পাব।

প্রয়াত নেতা কমরেড নলিনী দাসের স্মৃতির প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

'একতা', ঢাকা ২৫-৬-৮২

নলিনী দাস আর নেই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা কমরেড নলিনী দাসের জীবনাবসান ঘটেছে। ১৯ জুন, শনিবার, দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তিনি কলকাতায় মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা কমরেড নলিনী দাস ১৯১০ সালে বরিশাল জেলার ভোলায় জন্মগ্রহণ করেন।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। আন্দোলন করতে গিয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাভোগ করেন। ঐ সময় তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯২৯ সালে মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয় এবং '৩০ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৩১ সালে কারাগার থেকে পালিয়ে এসে কমরেড নলিনী দাস বরিশাল, কলকাতা এবং চন্দননগর এলাকায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন এবং একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। '৩৩ সালে কলকাতায় তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন এবং '৩৪ থেকে '৩৭ সাল পর্যন্ত আন্দামানে কারাগারে আটক ছিলেন।

আন্দামানের কারাগারেই কমরেড নলিনী দাস মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষা নেন এবং পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বরিশালে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। '৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকচক্র তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করায় তিনি আত্মগোপন করেন। '৫০ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। '৫৫ সালে মাত্র ১ মাসের জন্য মুক্তি লাভ করার পর তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। '৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

'৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির পর তিনি পুনরায় আত্মগোপন করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রথম সারির সংগঠক।

পৈতৃকসূত্রে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও কমরেড নলিনী দাস সবসময় ত্যাগী জীবনযাপন করেছেন। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত

সম্পত্তি তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি জনকল্যাণকর কাজে ব্যয় করার জন্য একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে দান করে গেছেন।

'৮১ সালের শেষদিকে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার বক্ষ-ব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিছুটা সুস্থ হলে তিনি গত মার্চ মাসের শেষদিকে আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য কলকাতায় গেলে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানকার বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে ভর্তি হন।

কমরেড নলিনী দাস ছিলেন অকৃতদার। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' নামে তিনি একটি বই লিখেছেন।

'দৈনিক সংবাদ', ২০-৬-৮২

নলিনী দাসের মৃত্যুতে ভোলায় শোকের ছায়া

ভোলা, ২২শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)—উপমহাদেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা প্রবীণ রাজনীতিক কমরেড নলিনী দাসের মৃত্যুতে ভোলার সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। গত ১৯শে জুন তিনি মারা গেছেন।

শ্রীনলিনী দাস গত ১০ই জানুয়ারী অসুস্থ অবস্থায় ভোলা থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা যান। সেখানে বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে অধিকতর ভাল চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১০ সালে ভোলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। কমরেড নলিনী দাসের মৃত্যুতে সমগ্র ভোলাবাসী মর্মাহত। তাঁর জমিতে প্রতিষ্ঠিত হোমিও কলেজ তাঁর মৃত্যু সংবাদের সাথে সাথে

তিনদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে এবং ২০শে জুন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এক শোকসভায় মিলিত হন। কমরেড নলিনী দাসের মৃত্যুতে তার প্রতিষ্ঠিত "প্রগতি পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র"-এর উদ্যোগেও ২০শে জুন বিকেলে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেট এ কে এম শাহজাহান সভাপতিত্ব করেন।

প্রগতি পাঠাগার আয়োজিত উক্ত শোকসভা শেষে উপস্থিত সকলে নলিনী দাস প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টি কার্যালয়ে গিয়ে নলিনী দাসের ব্যবহৃত কক্ষে ফুল ছিটিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

'দৈনিক সংবাদ', ২৫-৬-৮২

নলিনী দাস

(সম্পাদকীয়, 'দৈনিক সংবাদ')

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা, এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ নলিনী দাস আর নেই। তাঁর মৃত্যুতে এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের যে এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো শুধু তাই নয়, সেই সাথে ছিন্ন হলো পুরাতন ও নতুনের মাঝে এক গতিশীল বিপ্লবী যোগসূত্র। ব্রিটিশ ভারতে পরাধীন দেশবাসীর জন্য স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে গিয়ে জীবনকে বাজি রেখে দুঃসাহসিক বিপ্লবী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে একদিন যে তরুণ রূপকথার সৃষ্টি করেছিল আজ স্বাধীন দেশে সেকথা ক'জনারই বা জানা? তাঁর জীবনাবসানে ক'জনই বা আজ সে স্মৃতি স্মরণ করবেন? তবে সেজন্য আফসোসেরও কারণ নেই। স্বাধীনতা, প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্রযাত্রার মাঝেই এ সংগ্রামী ত্যাগী পুরুষের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে।

কিশোর বয়সেই নলিনী দাস 'অগ্নিমন্ত্রে' দীক্ষা নিয়েছিলন।

মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি গ্রেফতার হন ও কারাভোগ করেন। '২৯ সালে সেই মেছুয়া বাজার বোমা মামলায় হুলিয়া জারি, আত্মগোপন, গ্রেফতার, কারাগার থেকে পালিয়ে এসে আবার বরিশাল, কলকাতা ও চন্দননগরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কার্যকর-এর দায়ে আবার গ্রেফতার, ফাঁসীর আসামী—বয়স কম বলে দণ্ড হ্রাস করে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—এসব ঘটনা তো একদিন বাংলা তথা উপমহাদেশের মানুষের বুক গর্বে ভরে তুলত। সে কাহিনী তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত। তারপর মার্কসবাদে দীক্ষা। সে জীবনও তো ফুল বিছানো নয়। কারাগারে, আত্মগোপন করে কতকাল কাটাতে হয়েছে। আর তার মধ্য দিয়ে এদেশের মাটিতে বুনে গেছেন প্রগতিশীল ভাবধারার বীজ—জীবনের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে বিসর্জন দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সারির সংগঠক ছিলেন তিনি, যাঁর নেতৃত্বে সূচনা হয়েছিল পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে কুড়িআনার পেয়ারা বাগানের সেই বীরত্বপূর্ণ প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ। পৈতৃক সূত্রে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও নলিনী দাস যে ত্যাগী জীবনযাপন করে গেছেন তার নজির আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। অকৃতদার এ ত্যাগী পুরুষ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সব সম্পত্তিই বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাজে ব্যয় করার জন্য একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে দান করে দিয়ে গেছেন।

আমরা এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সেই সাথে অনুরোধ রাখবো এ সংগ্রামী পুরুষের স্মৃতি যেন মুছে না যায়—আত্মোৎসর্গের মহান দৃষ্টান্ত রেখে যারা আমাদের জন্য স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে গেছেন তাঁদের স্মৃতি যেন চিরকাল জাতিকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে। নলিনী দাসের স্মৃতি রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগের অভাব যেন না হয়।
